

756.3

013



কবিতা

আব্দিন ১৯৩০

মুদ্রণ বর্ষ, অথবা সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ১৪

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য

কৃত্তিকা

কোনো-এক লোকোত্তর কৃষকের কথা কোনো-এক কবিতায় আমরা পড়েছি। তাঁর অর্থ নিয়ে অনেক বানানুবাদ চলে, কিন্তু তাকে দেখছি সে-কবিতা উল্টো অর্থ সত্য হ'লো। যার হাতে ফসল ফললো তাকে নিয়েই সোনার তরী দিগন্তপারে চ'লে গেলো, প'ড়ে থাকলো। তার রাশি-রাশি ধান, সোনার ধান, যত নূর দৃষ্টি যায় যেন শেষ নেই।

এখন আমাদের উপর তার পড়েছে সেই ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে, সাজাতে হবে গোলঘরে ধরে-ধরে। তাকে বনতে হবে সকলকে—এসো, এখানে এসো, এখানে তোষার পুটি, বাস্কা, কলাশ। এখানে ছোমার উত্তরপুরুষের আনন্দের সময়।

কিন্তু এই ঘরে তোলার কাজটি—যার পারিতোষিক রূপে রবীন্দ্রনাথ—এখানে শুরু করায় শুরু। একখানি ছোট্ট খেত এত কিছের? এত বিচিত্র রবীন্দ্রের শব্দ? যেন একই সীমিত বিস্তারিত জগতের মতোই কৃত্তিকার মতোই আত্মকথিত। কেমন করে সম্ভব হ'ল?

এই প্রশ্নের প্রথম। য-কোনো মানুষ, যিনি রবীন্দ্রনাথের

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

স্বাভাবিক তাঁকে সহজেই বুঝে। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে
আঁকালে, তখু তাঁর আচরণ, চিন্তা, বিচার, আশি কালের প্রায়শ্চিত্ত
বিবাহ—তখু তাঁর আয়তনের বিষয়ে চিন্তা করলে তাঁর
সমালোচকের মনের প্রায় সেই দশা—ইতে পারে—যদিও
অর্থ—যে-দশা হয়েছিলো অর্থের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অবনতির
বধন উঠেছিলো। কাতারে-কাতারে কীর্তিবাহিনী দেখতে পেরে,
এমনও হ'তে পারে যে বেশ কড়াপাকের সমালোচকও বিহ্বল হবেন,
বলবার কোনো কথাই প্রথমে খুঁজে পাবেন না। অবশ্য যদি তিনি
বাঙালি হন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ টুক সেই ছাতের লেখক, সমগ্রভাবে না-দেখলে
ধাক্কা চেনাটো বানেন না। তিনি যে একজন মহাকবি, বিশ্বের
মহাসুন্দরের অন্তর্ভুক্ত, এ নিয়ে বাংলাদেশে আজকের দিনে আর তর্ক
নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিভার যেটি বৈশিষ্ট্য—যেখানে তিনি পাঠকের
পক্ষে বিপত্তিজনক এবং সমালোচকের পক্ষে হতাশাব্যবস্থা—সেটি এই
যে তাঁর মহত্ব তাঁর সমগ্রতায়। বিচ্ছিন্ন পরিকল্পিত তাঁকে পাওয়া
যাবে না, কবিতায় না, কোনো-একটি কবিতায় কিংবা সম্পূর্ণ একটি
গ্রন্থেও তাঁর পরিচয় বিধৃত হ'বে নেই। যে-কোনো অংশের চাইতে
তাঁর সমগ্র রচনাটি বড়ো, যে-কোনো একটি গ্রন্থের তুলনায় অনেক
বড়ো তাঁর সমগ্র রচনাবলী—তখু আয়তনে নয়, অর্থবহতায়। তাই
কোনো সংকলনগ্রন্থ তাঁর বখাৰ্ণ প্রস্তুত হ'তে পারে না, একেবারেই
অসম্ভব। যাপু অন্তর্ভুক্ত করলে, সমালোচনার অস্ত্র অনেক
অপ্রতিভ কাছের তাঁর সমগ্র রচনাতে পড়ে। যেন নদীর স্রোত
অপ্রতিভ—কোনো-একটি কীর্তিবাহিনী দিয়ে বলা যাবে না
রবীন্দ্রনাথ। কালিদাস বলতেই শকুন্তলা বনে পড়েছে
কাজেই কাউন্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলতে—গদিও বিদেশী পাঠক

নিশ্চয়ই জানেন উঠবেন গীতাভিত্তি—আমাদের পক্ষে এ-কল্পে কোনো
একনিষ্ঠতার বশবর্তী হওয়া অসম্ভব। ‘তুমি এসো, তুমি এসো,
তুমি এসো, এবং তুমি!’—এই বাক্যই আমাদের কথা, উল্লেখ্য যে
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর দিকে বিচার-চোখেও যখন দৃষ্টিপাত করি।
ওদের ভারতম্য নিশ্চয়ই আছে, সচিভেদে পক্ষপাতও আছে, কিন্তু
আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ কোনো ‘মাস্টারপীস’ কোথেননি,
তার কোনো একটি বা কয়েকটি গ্রন্থকেও শ্রেষ্ঠ ব’লে চিহ্নিত করার
উপায় নেই। পক্ষান্তরে, কালিদাসের লেখন স্বতঃস্ফূর্ত, না
শেষপীয়রের কলমটি অব এলর্ন, এষ্ট রকম উপেক্ষণীয় রচনা
রবীন্দ্রনাথের—কিছুই নেই নেতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু যেটুকু
আছে তা তার সমগ্র পরিমাণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এই
পরিমাণ, এই বিশ্বকর অঙ্গবর্তী—যাতে বাঙালীদের আবিষ্কার
করাও অসম্ভব নয়—রবীন্দ্রনাথের পূর্বনির্দেশন পক্ষে এরই চিহ্ন
প্রয়োজন ছিল।—এত বেশি না-লিখলে এত বাড়ি তিনি
হতেন না, অসংখ্য বার না-দেলে কোনো কথাই তাঁর বলা
হ’তো না, তার পরিমাণেই তাঁর মহত্বের পরিমাপ।

রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন করার দ্বিতীয় বিপদ তাঁর সর্বতোমুখিতা।
সর্বতোভাবে কবি—আবার সেই সঙ্গে এমন-কী আছে যা তিনি, নন্দ,
সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে বা তাঁর আগায় নয়?
নাট্যকার, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র-সম্পাদ-
ক, ধর্মোপকরণে কার্যনির্বাহী—এমনকি গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক। ‘এমনকি’
কিন্তু ভেবে-চিন্তেই বসিয়েছি। কেননা কবির সঙ্গে নাট্যকারের
বিভিন্নতার আত্মীয়তা আছে, গান আর কবিতায় তো সৌন্দর্য্যের
সমালোচনাও কবির কর্মের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কবিতায় আর উপাধিস
যে-ব্যবধান তাতে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং সেই

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যখন কাব্য আর উপন্যাস অঙ্গাঙ্গী মিশে ছিলো মহাকাব্যে ; আধুনিক কালের গল্প উপন্যাস এমনভাবে পৃথক্‌ত যে তা কবিতার সহবাসী হ'লে উভয়তই অস্বস্তির আশঙ্কা থাকে। তার কারণ শুধু রূপের—form-এর—ভিন্নতা নয় ; কথাটা এই যে কবিতা লিখতে, এবং আধুনিক অর্থে উপন্যাস লিখতে, দুই আলাদা জাতের মনের প্রয়োজন। পার্থক্যটা খুব সহজ ক'রে বলা যায় এইভাবে যে কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী ; ঔপন্যাসিক নিশ্চয় মানুষ, আর কবি মাজুক প্রকৃতির ; ঔপন্যাসিক নিজেকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বায়, আর কবি আনেন বিশ্বকে সংহত করে তাঁর অন্তরে। অবশ্য কোনো মানুষকে শুধুই অন্তর্মুখী বা শুধুই বহির্মুখী হ'তে পারে না, সকলের মধ্যেই দুয়েরই অংশ মিশ্রিত থাকে, সেটা মিশ্রণের মাত্রাভেদেই কেউ পান কবিস্বভাব, কেউ বা কথাকর, আর স্বল্পসংখ্যক কেউ-কেউ উভয় বিভাগেই আনাগোনা করেন। এটা শেষোক্তদেরও কোনো-এক দিকে পাল্লা ভারি থাকে ; কেউ লেখেন কবির প্রকৃতি নিয়ে গল্প, কেউ বা বৈঠকী মেজাজ নিয়ে কবিতা। প্রথম শ্রেণীতে উদাহরণ পাই ইংরেজি সাহিত্যে ডি.এইচ. লরেন্স, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাডিয়ার্ড কিপলিং। এঁদের বিষয়ে টি.এস. এলিঅটের মন্তব্যটি চিত্তনীয় ; তাঁর মতে যেখানে একটা ব্যক্তি কবি এবং কথানির্মী, সেখানে একটা দিক বেড়ে ওঠে অল্প দিকটাকে জখম ক'রে। এ-কথার সারবস্তায় বিশ্বাস জন্মায়, যখন দেখি যে লরেন্স, আর 'দি ডাইনাস্টস' সঙ্গেও টমাস হার্ডি, এই দুই কথানির্মীর স্থান হ'লো শেষ পর্যন্ত গৌণ কবিদের পিছন-বেষ্টিতে ; আর কিপলিং তাঁর অসামান্য ছন্দোমিতি নিয়েও সত্যিকার কবি হ'তে পারলেন না, হলেন, এলিঅটের ভাষায়, মহৎ পদ্যলেখক—'a great writer of verse'। কবিতায় আর

কথাসাহিত্যে সমান মর্যাদা কারো ভাগ্যে জুটেছে বলে শোনা যায় না ; ও-দুয়ের পরস্পরে মধ্যভাগ নেই, আছে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে দমিত অথবা বিক্ষুব্ধ করাই এদের স্বভাব ।

অতএব সাহিত্যের ধারা উভচর, একাধারে কবি এবং কথক, একদিক থেকে তাঁরা বিশেষভাবে সম্মানযোগ্য হ'লেও অঙ্গদিক থেকে তাঁদের অবস্থা একটু বিপজ্জনক । এষ্ট উভচরবৃত্তির অর্থ ঈশ্বরের অধীন হওয়া, এবং হয়তো কখনো এমন পথে পা বাড়ানো যাতে আপন স্বভাবের সম্মতি নেই । এষ্ট ঈশ্বরের সমাধান হয়েছে কিনা, হ'য়ে থাকলে কেমন ক'রে হয়েছে--রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনায় এষ্ট প্রশ্নই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য । এত বড়ো কবি হ'য়েও কেউ উপগ্রাস এ লিখেছেন, এমন ঘটনা পৃথিবীতে বেশি ঘটেনি, তাই এ-বিষয়ে কোতূহলের বিশেষ মার্থকতা আছে মনে করি ।

আমি আরম্ভ করবো এ-কথা বলে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর কথাসাহিত্যের একই আদর্শ বিচার চলবে না । তাঁর কাব্য, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা দাবি করে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকা, কিন্তু কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । তার প্রথম কারণ এষ্ট যে কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল : তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিস্তৃত, সামাজিক অবস্থার বৈসাদৃশ্য তার আবেদনের অন্তরায় হ'তে পারে । দ্বিতীয় কারণ ঐতিহ্যমিতে কাব্য আর গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান । কাব্যের দিকে বহু শতাব্দীর পুরোনো একটি ধারা ছিলো, সম্পদ ছিলো প্রচুর, রবীন্দ্রনাথের আংশিক আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত, বৈষ্ণব, বাউল কাব্য ; কিন্তু তাঁর উন্মেষের সময় বাংলা গল্প ছিলো অপরিণত, উপগ্রাস মতোজাত, এবং ছোটোগল্প নামক পদার্থের

অস্তিত্ব ছিলো না। লিখতে-লিখতে ভাষা তৈরি করতে হয়েছে তাঁকে, ভাবতে হয়েছে নতুন রূপ, নতুন রীতি : বাংলা গদ্যের যোজনব্যাপী পরিণতি এক জীবনে তিনি সমাধা করেছেন। এক জীবনে, কিন্তু ধীরে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রডিজি’ গোছের জীব ছিলেন না, মাইকেলের মতো চমক লাগাননি কখনো ; বেহেতু তাঁকে বহু দূরে যেতে হবে, তাই অতি ধীরে তিনি এগিয়েছেন। জীবদেহের মতো মস্তুর তাঁর পরিণতি, বনস্পতির বেড়ে ওঠার মতো : তাঁর স্বভাবে বিপ্লবী বৃত্তি ছিলো না, ছিলো বিনয়, নিয়মনিষ্ঠা—যার অর্থ ডিসিপ্লিন। চলতি প্রথাকে মূচড়ে ভেঙে আশ্চর্য কিছু নতুন করার উদ্দ্যম তাঁর যৌবনের ইতিহাসে নেই ; তাঁর পথ নিশ্চিত বিবর্তনের : ঐতিহ্যের অনুসরণে, অগ্রজের অনুকরণে তাঁর পদক্ষেপ। তরুণ রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি কোনো বদল ঘটাতো যাননি : বাংলা কথাসাহিত্যকে বঙ্কিমের হাত থেকে যে-অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই যাত্রা করেছিলেন তিনি।

উপরন্তু লক্ষ্যণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ধীরগামিতার লক্ষণ তাঁর পদ্যে ততটা দেখা যায় না, যতটা তাঁর গদ্যে। ঠিক ধীরগামিতাও নয়, কেমন ভীরুতা বেন—যাকে প্রায় রক্ষণশীলতা বলা যায়—কিংবা যেন অব্যবস্থিত হ’য়ে আছেন, মনস্থির করতে পারছেন না। পদ্যে তিনি প্রথম থেকেই বিশিষ্ট, প্রায় কৈশোর থেকেই নিজের গলায় কথা বলছেন—যদিও চলতিকালের ক্যাশনের সঙ্গে সেই গলার একটুও মিল ছিলো না। কিন্তু গল্পে—আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে আমাদের—গদ্যে তিনি চলেছিলেন অর্ধোস্তর জীবন ভ’রে প্রথাসম্মত পথেই—বঙ্কিমের সংলগ্ন হ’য়ে সতর্কভাবে পাকলে। তাঁর পক্ষে সেটা যে ঠিক স্বাভাবিক ছিলো না, তার

কবিতা

আবিন ১৩৫১

চমৎকার প্রমাণ মেলে তাঁর ভাষার ভঙ্গিতে। তাঁর কৈশোর থেকে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত, তাঁর গল্পের ছোটো পাশাপাশি ধারা আমরা দেখতে পাই, একটি সরকারি, অল্পটি ঘরোয়া, একটি 'সাধু', অল্পটি চলতি ভাষায়; একটি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ্য, অল্পটি চিঠিপত্রে নেপথ্যবিহারী। যাকে আজকাল আমরা চলতি ভাষা বলি, তাতে আবাল্য আনন্দ ছিলো রবীন্দ্রনাথের; যখন 'স্বাধীনভাবে' লিখতেন, প্রকাশের কথা ভাবতেন না, তখন ঐ গল্পে আসতো তাঁর কসমে—সে-গল্প বন্ধিমের অধমর্গ নয়, ছাত্তার পাঁচারও না, সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব এবং নতুন—এবং সেটা গল্পেই প্রচ্ছন্ন ছিলো ভবিষ্যতের বহুং সম্ভাবনা, বাংলা চলতি গল্পের—আধুনিক গল্পের—প্রথম পরিমার্জিত রূপটি তাঁরই হাতে রচিত হয়েছিলো তাঁর পত্রাবলীতে। কিন্তু এটা ধারাটিকে তিনি অন্তঃপুরিকা রূপে রেখেছিলেন, এমনকি উপেক্ষা করেছিলেন, যেহেতু তৎকালীন শাস্ত্রমতের তাদে অমুমোদন ছিলো না। যিনি আঠারো বছর বয়সে দীপ্তিশালী 'ইউরোপপ্রবাসীর পত্র' লিখেছিলেন, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে 'ছিন্নপত্র'র অপরূপ পত্রাবলী, তিনিই আবার একই সময়ে গল্পের সংলাপের অংশেও 'সাধু' ভাষা লিখেছিলেন, এবং চলতি ভাষাকে ভালোবেসেও তাকে ঘরে তুলতে পারেননি, যতদিন না বাইরের দিক থেকে তাগিদ উঠেছিলো। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পার, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, জগৎবিখ্যাত হয়েছেন, তবু তো ঐ 'জাত-খোয়ানো প্রিয়া'কে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর দরকার হয়েছিলো 'সবুজপত্র'র উদ্বোধন, প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্ব। তাবতে অবাক লাগে আমাদের।

যেমন গল্প রচনায়, তেমনি উপন্যাসের ভিতর-মহলেও, বহুকাল পর্যন্ত গতানুগতির বাঁধ তিনি ভাঙতে পারেননি। এখানে গতানুগতি

কবিতা

আশ্বিন ১৩৪২

মানে অবশ্য—বন্ধিমী আদর্শে রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন বলবো না—ভুল করার কথাই এখানে অবাস্তব, কেননা বেছে নেবার সুযোগ তাঁর ছিলো না। অনুরণনযোগ্য একটিমাত্র আদর্শ ছিলো তাঁর সামনে, সে-আদর্শ বন্ধিমের। রবীন্দ্রনাথ ধাপে-ধাপে এগিয়েছিলেন—টপকে পেরোতে যাননি—তাঁর এটো ঐতিহ্যবোধ বন্ধুর কাছ করেছিলো তাঁর। পূর্বপরতা লঙ্ঘন ক'রে হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিশ্বয়ের সৃষ্টি হ'লেও অনেক সময় নিবীজতার আশঙ্কা থাকে—তা থেকে আর অণু কিছু জন্মায় না, এর দৃষ্টান্ত মাইকেল দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের সহজবোধ এখানে তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছিলো, কিন্তু দৈবদোষে তাঁর আদর্শ আর উন্মুখতায় সংগতি ছিলো না। বন্ধিম ছিলেন স্বভাবতই ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই কবি, অগ্রভের নৈপুণ্য ছিলো রহস্যময় ঘটনাবিস্তার, আর মানুষের মন নামক রহস্যময় বস্তুটি ছিলো অগ্রভের সন্ধানস্থল। ফলত, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-উপন্যাসে একটা অস্বস্তির ভাব ধরা পড়ে, যেন লেখকের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে যেতে চাচ্ছে, যখন হৃদয় চায় হৃদয়ের কথা বলতে তখন মগজের কারখানায় চলছে থ্রুটের চতুরালির চেষ্টা। এ-চেষ্টা একবার অস্তুত অপাচেষ্টায় দাঁড়িয়েছিলো 'নোকাডুবি'তে—'বৌ ঠাকুরানীর হাটে'র কথা ছেড়েই দিলাম; কিন্তু 'নোকাডুবি'র ভরাডুবি ভেমন উল্লেখ্য নয়, কেননা ঐ ঘটনাক্রটিম অসংগতিবহুল উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের লক্ষণযুক্ত রচনাবলীর মধ্যে পড়ে না, প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। বইটি ভালো নয় ব'লে দুঃখ করি না, দুঃখ এটো ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ও-রকম বই লিখতে রাজি করিয়েছিলেন নিজেকে। আরো আশ্চর্য লাগে—প্রায় বিশ্বাস হয় না—যখন ভাবি যে 'নোকাডুবি' লেখা হয়েছিলো

‘চোখের বাসি’র বছর চারেক পরে ;—সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে পঞ্চাদশসংস্করণের দৃষ্টান্ত এই একটি ছাড়া ছুটি বোধহয় নেই ।

বাংলা সাহিত্যে অরণীয় গ্রন্থ ‘চোখের বাসি’ । তার কারণ এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, যাকে বলা যায় মনস্তত্ত্বচর্চিত, অর্থাৎ যেখানে বাস্তবের দিক থেকে ঘটনা সাজাবার কৌশলটাই প্রধান নয়, মানুষের মর্মকথা টেনে বের করা যার লক্ষ্য । কিন্তু এখানেও শেষ লক্ষ্য হয়নি । উপন্যাসের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে আর উত্তরাধিকারের মে-বিরোধ ছিলো, তার তৃপ্তিহীনতার সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত ‘চোখের বাসি’র উপসংহার । তখনকার পাঠকরা কেউ আপত্তি করেছিলেন জানি না, কিন্তু বিনোদিনীর তুচ্ছ পরিণাম আমাদের কাছে অগ্রাহ্য—রাসের দিক থেকে তা-ই, নীতিধর্মের দিক থেকেও তা-ই । ‘মানোরঞ্জনী প্রেমপ’ লাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তার নিভেজর ভাষাতেই বনছি ; একদিক থেকে বিধবা প্রেমিকার সমুচিত, অর্থাৎ অসুচিত, শাস্তিবিধান করেছিলেন, অন্য দিক থেকে চেয়েছিলেন তৎকালীন কামুন-মতো কাহিনীটিকে সুগোপনভাবে শেষ করতে । এই দ্বিবিধ দোষলা ‘চোখের বাসি’র অপঘাত ঘটিয়েছিলো ।

আমরা সাধারণত ব’লে থাকি যে উপন্যাস লিখতে হ’লে প্লট চাই । কিন্তু প্লটের ক্ষণে যে-ধরনের উদ্ভাবনীবুদ্ধি লাগে, তা কবিত্ব-শক্তির অমুগামী নয় ; ও-ক্ষেত্রে কবির অনেক সময়ই ফেল হ’য়ে থাকেন ; আর কেউ-কেউ সে-রকম কোনো চেষ্টাই করেন না, পুরোনো গল্পই নতুন ক’রে লেখেন । শেখরপিয়াড়ের সাইত্রিশটি নাটকের মধ্যে শুধু একটির কাহিনীর অংশ মৌলিক—এবং সে-নাটক ঐ একটি কারণেই উল্লেখযোগ্য । কিন্তু কাব্য-নাট্য আর গল্প উপন্যাসের জ্ঞাত অজ্ঞাত, একের আদর্শ অন্যের উপর চাপানো

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

যায় না। অবশ্য আধুনিক যুগে উপন্যাসেও প্লটের ধারণা বদলেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়ের ছিলো। উনিশ শতকী ধারণা : প্লটের অর্থ ছিলো খানিকটা ঘোরপ্যাচ, কী-হয়-কী-হয় কল্পনামে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়া, তারপর গ্রন্থিমাচনে সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেয়া, বন্ধিয়ে দেয়া। এর যান্ত্রিক দিকটায় স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না রবীন্দ্রনাথের, তাই তাঁর গল্পাংশে এত বেশি পাওয়া যায় আকস্মিক ঘটনা—অ্যান্ডেডেট : কাকতালীয় ফিরে আসে বার-বার। কিন্তু এই প্লটের দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়েও আপন বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন ‘গোরা’ উপন্যাসে :—এখানে বড়ো একটি বক্তব্য ছিলো তাঁর, সেই বক্তব্য ধরাবার মতো কাহিনীর আধারও তৈরি পেয়েছিলেন, আর এই সংযোগের ফলে সর্বোচ্চ সম্পূর্ণ হয়েছে ‘গোরা’—লেখকের স্বভাব কোথাও বাহ্যত হয়নি, কুচি কোথাও খণ্ডিত হয়নি, এখানে আচ্ছন্ন আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারি। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যমণি এই গ্রন্থ, উপন্যাসরূপে সবচেয়ে তৃপ্তিকর, গঠনশিল্পে নিটোল, চরিত্রসৃষ্টিতে উজ্জ্বল, কাহিনীর বিন্যাসেও নিবিড় :—এই একটি বই পড়ে ধারণা হয় যে অসুস্থ একজন মহাকবিকে উপন্যাসিকেরও উপাদান দিয়েছিলেন তাঁর ভাগ্যবিধাতা।

আগে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন, হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যাননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনে দু-বার কিছু বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। প্রথমটি এতটাই বড়ো যে বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছয়, দ্বিতীয়টি তেমন না-হ’লেও তাতেও কিছু আকস্মিকতা ছিলো। প্রথম বার ‘সবুজপত্র’র যুগে—যখন তিনি কাব্যে লিখলেন ‘বলাকা’, আর গদ্যে লিখলেন ‘চতুরঙ্গ’, ‘চতুরঙ্গ’র অব্যবহিত পরে ‘ঘরে-বাইরে’। দ্বিতীয় বার—যখন বাংলা সাহিত্যের তরুণ মহলে আর-একবার বিজ্ঞোহের ঢেউ উঠেছে—যখন তিনি

‘শেষের কবিতা’ লিখলেন, প্রায় একই সময়ে ‘যোগাযোগ’, তারপর ‘পুনশ্চ’। আসল কথাটা হয়তো এই যে বড়ো বদল একবারই ঘটেছিলো, প্রথম বারের ভাঙনের পর অনিবার্য ছিলো মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। ‘সবুজপত্র’ মুক্তি দিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে ; অবিরলভায় যদিও কোথাও কাক নেই, তবু নদীর স্রোত তীব্র বাক নিলো এখানে : ‘সবুজপত্রের’ আগে এবং পরে যেন চুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে-সময়ে পুরোনো কুল ছাড়লেন তিনি, বহুদিনের অনেক অভ্যাসের বেড়ি ডাঙলেন, যে-কুল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।

- এটো নতুন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিকই প্রতীয়মান হলেন, কিন্তু কবিতার চেয়েও প্রবলভাবে তাঁকে চেনা গেলো তাঁর গদ্যে। গদ্যে এতদিন সতর্কভাবে চলছিলেন, যেন তাঁরই ক্ষতিপূরণস্বরূপ একেবারে নিভয় হলেন এবার। সেই-যে ‘ঘরে-বাড়িরে’ত চলতি ভাষাকে বরণ করলেন, জীবনে আর ‘সাধু’ ভাষা লিখলেন না ; আরম্ভ করলেন ভাষা নিয়ে পরীক্ষা : ভাঙলেন, গড়লেন, ছোট্ট দিলেন, জুড়ে দিলেন, সমস্তটাকে মিলিয়ে দিলেন নতুন ছন্দ : বেগ আনলেন বাংলা গদ্যে, আনলেন তীক্ষ্ণতা, নমনীয়তা, লাস্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এটো গদ্য-সাধনা ; ‘ঘরে-বাড়িরে’ থেকে ‘ছেলেবেলা’ পর্যন্ত গদ্য ভাষাকে যত রকম করে মুচড়ে বেঁকিয়ে তিনি চালিয়েছিলেন, তাতে বাংলা গদ্যের রূপান্তর ঘটেছে এ-কথা বললে অত্যাশ্চর্য্য হয় না।

উপন্যাসের রূপের দিকেও বদল হ’লো। উনিশ শতকী প্লেটের মোহ কেটে গেলো ; উপন্যাস হ’য়ে উঠলো বক্তব্য-প্রধান, ভাবনির্ভর। সেই সঙ্গে চললো কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্র রকমের পরীক্ষা। পত্রাকারে গল্প, ডায়েরির আকারে উপন্যাস, ‘চতুর্দশের

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

নিবিড় সংহতি—এ-সবের পরেও ‘শেষের কবিতা’র নতুনতর কারুকার্য। এ-সব পরীকার অর্থ, বলা বাহুল্য, শুধুই বৈচিত্র্যসাধন নয়, এর জন্য মানের দিক থেকে তাগিদ ছিলো। তিনি যা চাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন, পরখ করে-ক’রে দেখছিলেন, তা উপন্যাসের এমন একটি রূপ, যা কবির স্বভাবের পক্ষে অমুকূল। তাঁর ভিতরকার কবিতা যাতে প্রকাশ পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথামিশ্র, এটাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক অচেতন মানের লক্ষ্য। তাই কাহিনীর অংশ সরল হ’লো, মধু হ’লো উদ্ভাবনার দায়, এলো স্বগতোক্তি, মননশীলতা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি। প্রধান হয়ে উঠলো পাত্র-পাত্রীর মন তারা কী করেছে, কী ঘটছে তাদের ভাবনে, সেটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র, অপরিহার্য ছিল। তাঁর উত্তরজীবনের কথাসাহিত্যে কোনো নিছক গল্প বলতে যাননি রবীন্দ্রনাথ, মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন উপন্যাসকে কাব্যের সধনী ক’রে তুলতে।

এর ফল, মানতেই হয়, সর্বত্র সমান হয়নি। ‘চতুরঙ্গ’ের সৌম্যমোর তুলনা নেই ‘যোগাযোগ’, অসমাপ্ত হ’লেও, কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সার্থক মিলনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু ‘ঘরে-বাইরে’ অতিকথনে ভারাক্রান্ত, ‘শেষের কবিতা’র গল্পাংশ দুর্বল, ‘চার অধ্যায়ে’ কোথাও-কোথাও সন্দেহ জাগে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে চ’লে যাচ্ছেন। এদের ছিন্নসন্ধানে বেশি কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টিও লাগে না, কিন্তু এ-সব বই যাতে রক্ষা পেয়েছে—শুধু রক্ষা পেয়েছে তা নয়, আলো, তাপ, প্রাণ পেয়েছে যেখান থেকে, সেই উৎস আর-কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপ্রতিভা। কবিতাই সেই শক্তি, যাতে শেষ পর্যন্ত কাঁড়া কেটে গেছে, যাতে এ-সব বইয়ের সম্মোহনী প্রভাব কিছুতেই ঠেকানো যায় না। কবি কাঁড়া আর কারো হাতে

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

‘শেষের কবিতা’ সম্ভব ছিলো না—এ-বইয়ের পঞ্চাংশই তার কারণ নয়—কবি ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিলো না এলা-অস্তুর দীর্ঘায়িত সংলাপে মুগ্ধ ক’রে ধরে রাখে আমাদের !

তাহ’লে মোটের উপর লাড়ালে কী ? দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সংগতি ঘটাতে পারেননি—এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অশ্রাব্য হয়। দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে ‘নোকাডুবি’র কৃত্রিমতা, আর যখন প্রাশ্রয় পেলো তখন দেখি ‘ঘরে-বাটেরে’র আতিশয্য, ‘শেষের কবিতা’য় বিষয়বস্তুতে ব্যথার্থ্যের অভাব। আবার সেট সঙ্গ এও দেখি যে তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণই তার কবিত্বগুণ ; পূর্ব-রবীন্দ্রর উপন্যাসে পাঠ্য ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু ‘ঘরে-বাটেরে’, ‘শেষের কবিতা’, এ-সব বই বীজের মতো কাজ করেছে বাংলা সাহিত্য, তা থেকে অন্য বই ভল্ল নিরেছে। এই অবস্থায় কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হ’লে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সস্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অণুটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে কোনোটাকে বিছিন্ন ক’রে নেয়া যায় না। সে-রকম বই ‘গোরা’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘বোগাযোগ’, কিন্তু এই সংগতিসাধনের দৃষ্টান্তরূপে সর্বাত্মক যার নাম করতে হয়, সে-বই ‘গল্পগুচ্ছ’।

✓ ‘গল্পগুচ্ছ’ আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিক থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তা-ই। বাংলাভাষায় প্রথম ছোটোগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এবং এমন সময়ে লেখেন, যখন ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটোগল্প নামক ধরুটির চল হয়নি। যৌবনে পদ্মার বুকে ‘সজন-

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

নির্জনের নিত্যসংগমে' যখন বাসা ছিলো তাঁর, যখন 'সোনার তরী' লিখছিলেন, তারপর 'চিত্রা'. সেট একটু সময়ে ছোটোগল্পের ধারাটি তাঁর খুলে গিয়েছিলো। শুভযোগ ঘটেছিলো তাঁর জীবনে; ঠিক লোকালয়ে ছিলেন না, কিন্তু কাছাকাছি ছিলেন; সংসারের জড়িত ছিলেন না, কিন্তু মানুষের সংসারঘাতার দর্শক হ'য়ে ছিলেন। কল্পনার উৎসাহ ছিলো উদার আকাশে, আবার মানবচরিত্র লক্ষ্য করারও সুযোগ ছিলো। এট অবস্থা কবির পক্ষে তেজস্কর, কথা-শিল্পীরও পুষ্টিসাধক। এট সময়ে একটি-দুটি ক'রে 'আপনার মনোমতো' যে-সব গল্প তিনি লিখেছিলেন, পরবর্তী অল্প সব রচনাবলীর পাশে রেখেও তাদের সজোড়াত টাটকা ভাবটা একটুও উবে যায় না, বরং তুলনা ক'রে দেখলে তাদের অফুরান প্রাণশক্তিতেই বিস্মিত হ'তে হয়। 'গল্পগুচ্ছে', আর তার যমজ বই 'ছিন্নপত্র', রবীন্দ্রনাথের গল্প বইয়ের মধ্যে এট দুটির আনি নাম করবো, যা অসংখ্য বার পড়েও পুরোনো হয় না ✓

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প অধিকাংশ তাঁর পূর্বজীবনের রচনা। তখন তিনি উপন্যাসে বঙ্কিমের অধীন ছিলেন, কিন্তু ছোটোগল্প লিখতে গিয়েষ্ট তাঁর পথ ভিন্ন হ'য়ে গেলো। বঙ্কিমের সাড়ম্বর শোভাযাত্রার পরে, রাজহাজড়িত অলোকসামান্য ঘটনাবলীর পরে, রবীন্দ্রনাথ আনলেন লৌকিক জীবনের ছবি, সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখঃখের কাহিনী;—সমস্ত 'গল্পগুচ্ছে'র উপাদানে, একমাত্র 'মহামায়া' গল্পে ছাড়া, আর কোথাও বঙ্কিমের অনুগামিতা নেই। যেমন বিষয়বস্তুতে গল্পগুলির স্বকীয়তা, তেমনি রচনাশিল্পেও প্রথম থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বেশি; সমসাময়িক গল্পে আর উপন্যাসে প্রায় যেন তুলনাই চলে না; যতদিনে রবীন্দ্রনাথ 'পোস্টমাস্টার' থেকে 'নষ্টনীড়' পর্যন্ত পৌছে গেছেন, ততদিনে 'চোখের বালি' মাত্র

পাওয়া যায়, আবার 'নৌকাডুবি'র অনতিপরে পাঠে 'নাস্টার মশাই', 'শুশ্রূষা'। উপন্যাসের তুলনায় গল্প কত সুপরিণত ; গল্প যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দ, সেখানে উপন্যাস কেনন আড়ষ্ট, যেন অংশুত বানিয়ে-তোলা। গল্পে আর উপন্যাসে এই ব্যবধান দেখে বিশ্বরের উদ্বেগ হ'তে পারে, কিন্তু লেখক যেখানে কবি, সেখানে এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো, কেননা কবিতা আর উপন্যাসে বিরোধ থাকলেও ছোটোগল্প কবিতাপ্রতিভার অন্তর্কুল। কথাসাহিত্যের এই দুই শ্রেণীতে সব সময় সৌহার্দ্য থাকে না। এর এক দিকে শক্তি থাকলে অন্য দিকে অবশ্যতই দুর্বল জন্মে না ; আত্মন চেতন কখনো

✓ উপন্যাস লেখেননি, ভর্তিনিয়া উল্লেখের একটিও ছোটোগল্প নেই। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সনগ্রহভাবে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর স্বভাবের পক্ষে ছোটোগল্পের উপযোগিতা বেশি ছিলো ; কবিতায় তিনি যত বড়ো, ছোটোগল্পে তার কাছাকাছি, কিন্তু — 'গোরা' মতঃ, 'যোগাযোগ'ের সূচনা মতঃ—উপন্যাসে তাঁর আসন ভিন্ন। শুধু তাঁর ক্ষেত্রে নয়, সাধারণভাবে বাংলা উপন্যাস বিষয়েই এ-কথা সত্য : বাংলা সাহিত্যে যেখানে উৎকৃষ্ট, সেখানে কবিতা আর ছোটো-গল্প যত দেখতে পাঠে, উপন্যাস সে-তুলনায় অল্প। এর কারণ হয়তো বাঙালি জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি, হয়তো বা বাঙালি মনের গীতধর্মিতা ; কিন্তু কারণ যা-ই হোক, বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতা সুস্পষ্ট, আধুনিক পশ্চিমী অর্থে মহৎ কোনো উপন্যাস বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের যে-সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে ✓ বহুমুখী বাস্তবদেবতা হ'লেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান স্থপতি, আর—যেহেতু তিনি 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন, 'শেষের কবিতা' লিখেছেন—পরবর্তীরাও যাত্রাস্থল ;—এর পর যারা বাড়াবেন, বদলাবেন, নতুন-নতুন মন্ডল বানাবেন, তেতলার উপর চারতলা-পাঁচতলা

কবিতা।

আশ্বিন ১৩৫২

ভুলবেন ধারা, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ না-নিলে তাঁদের প্রস্তুতি
সম্পূর্ণ হবে না। রুচির গুরু তিনি, রূপায়ণের, ভাষাশিল্পের :
যেখানে তিনি নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তিনি
অবশ্যম্ভাব্য, আর যেখানে তাঁর ভুল হয়েছিলো, সেখানেও উত্তরকালের
শিক্ষার ক্ষেত্র পড়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু

('বৃগাস্তব'র সৌজন্দ্যে)

চারটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

পারাপার

এই দূরত্বের সাক্ষাৎ, পাথরের বাঁধানো কল্লাকালেশ
কতদিন পেরিয়েছ মনে ;
একান্ত পৌছানো সেট নিবিড় গোপনে ;
মধ্য নীল যোজন যোজন কাল টেউ ।
বুকের শহরে আজ সত্যি এসে, বেলানেশেষ
অবিশ্বাসী চল পথে, রেশুরায় চা নিয়ে ধ্যাননে
কী চোখে ভিড়কে দেখে জানবে না কেউ ।
তবু তো এ আসা নয়, এসেছ কেবল--
কার্মেলিতা, কেন এসে খুঁজতে আরেক ভ্রমফল ॥

এরা অন্য ভাষা দিয়ে ভালোবাসে, হাসে,
অন্য মন্ত্র প্রার্থনায় পূজা দেয়, নেয় ;
শনিবার বাজারের ফুলফল ভরা
আরেক মাটির শব্দ সুপ করা,
ক্যাথিড্রালে ঘন ঘণ্টা বাজানো চক্রে
অচেনা আত্মীয় ভিড় করে,
প্রকাণ্ড পিতল-বাঁধা কাঠের তোরণ,
অগণন
দোকানী, যাত্রীরা ঢোকে যিস্তৃষ্টি মূর্তিভালে
অশ্রুভালে
নতজানু তনয় আধারে ;
সারি সারি মোমবাতি জ্বলে ধারে ।

কবিতা
আশ্বিন ১৩৪২

কার্মেলিতা, এ কী
পূর্বাচল পশ্চিমের একাকালে আসে গেছে ঠেকি ॥

চল, কার্মেলিতা, চল আবার তোমার নিজ দেশ ।
এখানে আসবে কাছে স্বপ্ন-চলনের বেশ

কায়। ঢেউ যোজন যোজন পার হয়ে,
সম্পূর্ণ মিলন পাবে একাসীনা, দৃষ্টির প্রত্যয়ে ।
এ আসা তো আসা নয়, ইঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বাকের শতর চিরে
শোনা চেনা কণ্ঠ, দেখ চেনা চোখ তবে
মূহুর্তে মূর্তায় সব শেষ হবে ।

—এবারে মিলন শুধু বিরহ উৎসবে ।

তুই ভুল তুই থাক, মধ্যে মাঝে পারাপার,
কার্মেলিতা, দেখ এক প্রেম পারাবার ।

কোমি আইল্যাও

রঙিন রুমালে গেরো কুঁ দিয়ে খেলা যে, বাজিকর,
রঙা মেঘ-ওড়নায় হাওয়ার কৌশল তারো বেশি,
অম্পর্শ হাঙ্ক। গ্রন্থি খোলে বাঁধে সোনালি প্রহর
কে দেখে নাই বা দেখে : ম্যাজিকের তাঁবু সর্বদেশী ।

মাথার টুপিটা খুলে এক ঝাঁক পায়রা ওড়াও—
গম্বুজে আরেক মজা, সাদা কালো নানান রকম :
পায়রা আপনি ওড়ে, খোপে ঢোকে বকম বকম :
স্কাউটপরের মাথা তারো উদ্দেশ্য বিছাৎ উধাও ।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

অপার্থিব জাহ্নু খোঁজে ধার্মিকেরা দৈব ঘটনায়
তারো চেয়ে অলৌকিক লোকে আছি প্রত্যেক নিমেষে,
নিয়মের ভেল্কি সে তো সব প্রত্যাশার পারে মেশে,
স্বপ্নে ওড়ে প্রজাপতি গুটি-কাটা রেশমি মায়ায় ।

ছিল না, এই তো চাঁপা, গন্ধের চন্দ্রের বিন্দু রাতে ;
অতলান্তে ঐ ঢেউ মেতেছে হঠাৎ পূর্ণিমাতে :
প্রথম শিশুর কাণ্ডে মা'র ডাক ; যৌবন রঙিনা :
ত্রিভুবন তাটে বসে এর চেয়ে কোথায় অসীমা ?

আশ্চর্যের কান কালা, দৈব তাই হরবোলা খোঁজ,
প্রত্যেক মানুষ দৈব তা না ছেনে অবতার খেলে
ইয়াকি হে বাজ্রিকর, করো বন্ধু, চোখে ধূলো ফেলে
হাত-সাক্ষাইয়ের পয়সা ! নকল ধর্মের বেশি ও যে ॥

- সান্টা বার্বারা

কী দিয়ে ভরাবে ?

ভ'রে

ওঠে

প্রশান্ত সমুদ্রে নীল ক্ষণ

কোটে

দূর তীর আবির্ভাবে

বন ;

সুরে সুরে

আঙুর নারঙি গুচ্ছ বর্ণমিন

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

কালো সোনা পর্যাপ্ত অক্ষরে

ভরে এ নির্জন—

হালকা রোদ্দুরে ভরা হালকা হাওয়ায়

ক্যালিফোর্নিয়ায় ॥

বাসন্তী হু চোখে

স্বচ্ছ আলোকের ধরে

নেশা ।

আশ্চর্য ভাস্কর্যে নেশা ষ্টেমলানি-ষ্টেম্পানি

গির্জার গম্বুজ চূড়া উল্লসানী ।

কঠোর দেয়ালে চক্রে

শাদা রিক্ত পরিখার পারে

খেজুরের ঝড় ছায়া পড়ে ।

ঋতুভ্রতা চলেছে ভিক্ষুণী মত পদচারী

রুদ্ধাক্ষের জপমন্ত্র শুনি—

ধ্বনি তারি

সন্ধ্যার প্রার্থনা স্বরে

সমুদ্র মর্মরে

প্রসন্ন আলোয় ভরা শাস্ত্র হাওয়ার

ক্যালিফোর্নিয়ায় ॥

দিগন্তে লুকোনো পূর্বদেশ :

অগাধ অদৃশ্য লীন

ছায়া করে

ওপারে জাপান চীন,

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

—ছবির ভারতী রেখা নিকরদেশ ।

ওড়ে

অস্তিম গোধূলি ঘন তটে

খেলার নিশান

ঘোরে

উদ্ভাস তারি

রঙিন বেনুন সারি সারি ।

বাগানে রেডিও গান ।

দেখ, ভর-ভর রাতে স্বচ্ছ পাটে

তারা ওঠে ।

কোটি আলো জ্বলে নেভে বিদায় হাওয়ায়

ক্যালিফোর্নিয়ায় ॥

লাল ঘনসা

আমার কাঠের বাড়ি সাদা নীল ;

আসতে চাও, এসো ঘুরে,

রুক গাছ দীর্ঘ সারি

গলি তার পাশ দিয়ে ।

মনে রেখো এটা আরিজোনা—

চোখকে বিশ্বাস কোরো, যদি,

পাখা-ভাঙা পাথরের এঞ্জেল বাগানে

বোবা সাক্ষী উত্তর-পশ্চিম কোণে

তোমাদেবো স্বাসে বলে, হঠাৎ বিস্থিত ধম্কে “এ কী !”

স্তবকে স্তবকে

P11164

কবিতা
মাঘিন ১৩৪২

রক্তিম আদিম

রাঙা-কাটা মনসা ঢেউ ঘনতর

কাটার আংটি-পরা হাতে ধরে নেশা

মাটির বেদনা-জাগা নিজা কুহকিনী

লাল মনসা, লাল মনসা

চেতনার মগ্ন কেনা ছিটোয় রোদ্দুরে ছপুয়ে ।

চতুর্দিকে গাছ বাড়ি সর্বত্র আকাশী

আরব্য বালির ধূ ধূ এখানে কঠোর ঘর ভাঙা

আরিজোনা—

ওঙ্কার উঠেছে বাক্য পাথুরে নিখাদে মুয়েজিন

মরমী ধূসর ধ্বনি শূন্যে ঈশ্বরিত ॥

পায়েপায়ে জুতো না ঘ'ষে তোমরা যাত্রী সোজা এসো—

দরজা খোলা,

(পরিচ্ছন্ন বন আর কার্পেটের রুম্ম রোজই ছোঁয়)

ঘরে শুধু নরমী আয়েজ,

চারটে বড়ো বড়ো কাঁচ—সবই জানলা—ধারে

দাড়ালে ভাববে ক্রেম, ছবি কৈ ?—দেখে।

ঠিকরোনা রাঙা বন্যা পশ্চিমের পটে—

লাল মনসা, লাল মনসা

প্রত্যন্ত মানসী আশুন

লাল গালি দেয় তীব্র ভাষাতে পাহাড় ছটোকে,

কোণা-ওঠা পাঁজরা-কাটা ষথার্থ সন্ধ্যাসী পাহাড়

—আরিজোনা—

ধেয়ায় রঙের ধূস্রে উদাসীন ॥

কবিতা।

আশ্বিন ১৩৫২

কেন যে এখানে আছি ?

—“কেন” ঐ জানলার উত্তরে ।

রাত্রে শোণিতের শেঁ। শেঁ। মকু দেয় ঝড়,

উর্ধ্ব যুঁহঁ। স্বচ্ছ তারা পদ্মনীল,

নীচ ডাঙা অঙ্গারের গুপ্ত রাঙা ;

লাল মনসা, লাল মনসা ।

আমার নির্জন কোণী, ত্রয়ী যোগ,

ত্রিরাত্রিযাপন

প্রবাস সম্পূর্ণ করে চাটে শূন্য ঘরে

—আবিষ্কৃত

কণ্ঠস্বর শুনি

“আশ্চর্য ! এখানে তুমি ?”

এইখানে দেখা হল কবেকার—

সেই চোখে পরিণীত ধরনীতে

রক্তফুল তপ্ত মাঠে গাঁঠ-বাঁধা মৃত্যুলাগ্নে প্রাণ

দোখে যাউ ॥

এজ্জেনের ভাঙা পাখা মূর্তি পাথরের

একধারে ; ওদিকের হাওয়া ওঠে ;

সাদা নীল কাঠের এ বাড়ি ।

তোমরা দর্শক ফিরে বাগানের সেই পথ নিয়ে,

যেতে, দরজা তেজিয়ে নিঃশব্দে ॥

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

গীতম আপলিনেনয়র

জাফরান

অনুবাদ—বিশু দে

প্রাস্তর বিষাক্ত তবু হেমন্তে সুন্দর
ওখানে গরুর পাল চরে
নিজদের ক'রে তোলে তারা যে ভর্তর
নয়ানখালির আর লাইলাক'র রং জাফরান
ফোটে ঐ তোমার ছোঁচাখ ঐ ফুলের সমান
রক্তনীলা ফোটে যেন তোমার নয়ানখালি যেন এই হেমন্ত সুন্দর
আমার জীবনও ক'রে তোলে ধীরে নিজেকে ভর্তর
পাঠশালার ছেলে আসে হৈ-হৈ রবে
পরনে পিরান আর হারমনিকা বাজায় উৎসবে
তোলে তারা জাফরানের কুল সব মায়ের মতন
তাদের মেয়ের মেয়ে এবং তোমার আঁখিপাতার বরন
কাঁপে যা যেমন ফুল কাঁপে এই পাগলা হাওয়ায়

রাখাল কোমল সুরে গায়
এদিকে তো হাস্যরবে তাদের ধেমুর পাল চলেছে মন্দর
চিরতরে ছেড়ে এই বিস্তৃত প্রাস্তর দূষিত ফুলন্ত এই হেমন্তে সুন্দর

শীড়িত হেমন্ত

হে হেমন্ত রুগ্ন ও মধুর
তোমার অন্তিম আসে ঝঞ্ঝায় ঝরবে যবে গোলাপ-বাগিচা
ফুল-বাগানে যখন
হিমের লগ্নে

কবিতা।
আশ্বিন ১৩৭২

বেচারি হেমন্ত
তোমার মরণ এল তুম্বারের শুভ্রতায়
পাকা-পাকা ফলের সম্ভারে
আকাশের নিচে যেখানে শোনেরা ঘোরে
হরিংকেশিনী খর্ব জলপরীদের উদ্বেগ
যারা ভালোবাসে নি কখনো
দূর তেপান্তরে
কৃষ্ণসার ডাকে যুগীদের
আর আমি কী ভালোবাসি হে ঋতু তোমার নানান আওয়াজ
ফলগুলি ধূলিসাৎ কুড়ানীর নেই
বাতাস অরণ্য ফেলে
তাদের হেমন্ত অক্ষ পাতায় পাতায়
পাতাগুলি পায় পায় দলে
ট্রেন এক
ঘুরে ফিরে যায়
জীবনই যায় চলে ।

সর্বদাই

আমরা চলোছি দূরে আরো দূরে সর্বদাই অগ্রগতিহীন
এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে

নীহারিকা থেকে নীহারিকা
হাজার তিনটি ধূমকেতুর একটি যে নাগর গুয়ান
মাটি না ছেড়েই একবার

কবিতা
সান্নিহ ১৩৪২

চোখ রেখে নব-নব শক্তির উত্থানে
ছায়ামূর্তিদেরও নিয়ে গন্তীর বিচারে

আর বিশ্বে সবাই তো ভোলে নিজেদের
যারা সব ক্ষাপা ভোলানাথ
যারা তাই জানে পৃথিবীর এইটুকু ওইটুকু কোণ
আমাদের ভোলাবে যে কিসে
কোথায় সে কলহস ভোলালো যে এক মহাদেশ
হারাতেই

তবুও হারাতে আসলেই
পথ খুলে দিতে অকস্মাৎ আবিষ্কারে ।
হারাতেই

এ জীবন খুঁজে পেতে বৈজয়ন্তীকেই ।

কবিতা
—
শাশ্বিন ১৩৪২

আছে

জীবনামল্য কাল

এখন চৈত্রে'র দিন নিভে আসে—আরো নিভে আসে ;
এখানে মাঠের পারে শুয়ে আছি ঘাসে ;
এসে শেষ হয়ে যায় মানুষের উচ্ছ্বাস পৃথিবীর পাশে,
তু চারটে—বড় জোর একশো শরতে ;

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে হয়ে গেছে শেষ
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছাদের ভূমি—মনে হয়—এক তিলের সমান :
কিন্তু এষ্ট চেয়ে থাকি, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি অফুরান ।

চারিদিকে বড় বড় আকাশ ও গাছের শরীরে
সময় এসেছে তার নীড়ে ।
ভালো লাগে পৃথিবীর রুঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যতায় ;
অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয় ;

জেনে থাকা নক্ষত্রের বাগীশ্বরী ছোতনার থেকে কিছু দূরে ;
পৃথিবীর অবলুপ্ত জ্ঞানী বন্ধুরে
এই শুষ্ক মাটিতেই মিশে যেতে হ'ল জেনে তবু চোখ রেখে নীলাকাশে
শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে ।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

বিচ্ছেদ

মণীন্দ্র রায়

সূর্যকেই বুঝি সে প্রেমিক চেয়েছিল তার ঘরে
জ্বলে দিত উৎসবের ঝাড়। আসন্ন সন্ধ্যার রাঙা
আবেগের উত্তেজনা এঁকে দিল দীর্ঘ রেখা চেউয়ের উপরে
নদীর হৃদয়ে। কৈপে ওঠে জল, অন্ধকার, ডাঙা,
গাছের বর্মর, পাখি। ফুলের পাপড়িতে কৈপে
উঠল প্রজাপতি। ঘাটে জল নিতে এসে বধু শোনে
কী এক অস্পষ্ট ভাষা কেবলই ঘড়ার মুখ ছেপে
বুকে বাজে প্রতীক্ষার চাউনি কোটে ছ চোখের কোণে !

ওদিকে আকাশ তীব্র। পশ্চিমের অগ্নিবর্ণ ঝাড়
জ্বলে উঠল থরে থরে। রাত্রির গধুড়ে-খান্নে জ্বলো
ঝলমল ঝিকিয়ে উঠল। প্রেমিক ছ হাতে একবার
তুলে ধরে সে আগুন—মনে হয় রাত্রি তো বিলালো !
তারপর অন্বন শব্দে ভাঙে ঝাড়, খানখান অগ্নির
টুকরোয় নক্ষত্র জ্বলে, যন্ত্রণায় পৃথিবী অস্থির ॥

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

দুটি কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ব্যাং

আকাশে আবণসন্ধ্যা : অন্ধকার জমে ধরে-থরে
দিক থেকে দিগন্তরে : অঝোর ধারায় বৃষ্টিধারা
ঝরে মাঠে তেপান্তরে : গাছে-গাছে পাতা বেগে নড়ে
অশান্ত বাতাসে অবিরাম : ঝিঁ-ঝিঁ পোকা হ'লো সারা
বিহ্বল গুল্মে বনতলে : পথ থেকে গেলো লোক
ফিরে গেছে ঘরে-ঘরে জল জমে ওঠে মাঠে হাটে
আসন্ন বশ্মার অগ্রদূত : প্রকৃতির দুর্বিষহ শোক
অজস্র ধারায় নামে, নিস্তকতা জনহীন বাটে ।

আর আছে কোলাহাঃ : আন্তিক্রান্তিহীন শুধু ডাকে
নির্জন পথের প্রান্তে : বৃষ্টির ধারার সাথে-সাথে
বিহ্বল উতলা ডাকে : সেই স্বরে সুপ্ত শিশু জেগে
সহসা চমকে ওঠে : জননীর কণ্ঠস্বর থাকে
অনিশ্চিত গুপ্ত ভয়ে : রাত বাড়ে, বাতাসের বেগে
বশ্মার গর্জন বাজে : সূচীভেদ্য অন্ধকার রাতে

বন্ধ খেঁয়া পারাপার : মাঠ থেকে ক্রমে জল এসে
অনেক কুটিরে ঢোকে ছাগশিশু, বাছুরের ডাকে
আসন্ন প্রাবনভীতি : জরাজীর্ণ এই গ্রাম দেশে
কেবল ব্যাঙের দল মহোৎসবে ক্রীড়ারত থাকে ॥



কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

বিহীন যৌবন

আরো কিছুদিন থাকো : আরো কিছু মস্তিষ্কত গ্রহর
এখানে থমকে থাকো, প্রত্যাশের অর্থশূন্যতায়
‘অশাস্তি অতৃপ্তি দাহ যদিও জ্বলেছে সুপ্রথর,
অগ্নিক তরঙ্গ তোমো লগ্নশেষে সারা চেতনায়
যৌবনের আলো জ্বলে : বৃকে নিয়ে পাখির আবেগ
ছত্রভঙ্গ প্রহরের দিশেহারা মুহূর্তগুলির
থামে যেন দীর্ঘশ্বাস : কাল যেন অন্ধ গতিবেগ
এখানে সংহত করে, হোক রুদ্ধ চক্র বিভ্রান্তির ।

দারুণ ছঃখের দিনে, হে যৌবন, তুমি যদি এনে
থেকে যাও কিছুকাল, প্রসারিত পাথার ছায়ায়
রাখা ঢেকে সমুপগে, হিমশুভ্র ছ’টি ডানা মেলে
এখনি যেয়ো না উড়ে,—স্নায়ুক্লিষ্ট সারা চেতনায়
বিদায় নেবার আগে একবার শেষ টেউ তুলে
কেরানীরে করে। সুখী ; আনো স্বপ্ন কুমারীর চূলে ॥

কবিতা
শ্রাবণ ১৩৫৯

স্বপ্নাতাকে

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নিরেট রোদ্দুর দিয়ে ঝলসানো একটি ছপূরে
তুমি কি এখানে এলে—চোখে স্থিত শাস্তির প্রত্যাশা
দিনের দহন তুমি ধূয়ে নিতে সাগর খুঁজেছো,
দিত তো পারিনি, নেই, কুন্ত-ভরণীয় কোনো হৃদয়-সায়র ।

আমার হৃদয় ঘিরে তবু এক রোদ ঝলমিল
(কাপাতাক নর কোনো), শুধু-চোখ পক্ষিণীর হৃদ
এ-ছপূরে তবু আছে—আগাছায় ঘেরা তীর এক,
অথবা, সে হৃদ নয়, ঘোম-ঘোম ক্রান্তির সঞ্চয় ।

তবু তারি তীর ঘেঁবে মৃত পায় তুমি তো এসেছো
রেখে গেছ তারি বকে একখানি ভরপুর স্নান :-
তোমার এ-দান
ক্রান্তির পন্থলে যেন স্থিত শুভ্র পদ্যের করুণা,
সমুদ্রের সেউ মেয়ে এ-হৃদয়ে ক্ষণিক ঘুমালো ।

সে-কণ্ঠা গিয়েছে কিরে স্বরাপাতা-মর্মরিত পথে
সে-কণ্ঠার স্নান-সমাপন,
যাবার সময় সেই নীল শাড়ি নিঙাড়ি-নিঙাড়ি
তাড়া মাঠে রেখে গেছে অশ্রুণীল ব্যথার স্রবণ ॥

কবিতা।

আব্দিন ১৩৫২

প্রথমকার কবিতা।

রাজলক্ষ্মী দেবী

এক

হাসির ভিখারী আমি :—হুয়ে-পড়া, ক্লান্ত মন নিয়ে
তাই ছুটে-ছুটে আসি। কতো কথা বলি যে বানিয়ে,
—কোমল আঙুলে ছুঁই—কালো চুলে ছুঁই ঠোঁট গুঁজে
যত্নকে ছ'হাতে বুঝি। স্নান করি চুমোর সবুজে।
তোমার হাসিতে বাঁচি।

কতো যে বেদনা, আত্মা জানে—
না-ই বা জানলে তুমি। কান্নার চেয়ে না কোনো নানে
উজ্জ্বল রোদের মতো হাসি চাই। তাই নিয়ে আসা
সাত সমুদ্রের প্রীতি—ঘুম-ভাঙা স্পর্শের কুয়াশা ॥

দুই

ভালোবাসি —হয়তো বা তোমাকেই আমি ভালোবাসি।
তা নষ্টলে এ-কুটির, এ-উম্মে আমার কী কাজ ?
সন্দেহ কোরো না তুমি,—এ-হৃদয় হবে না সন্ন্যাসী।
—কাল সে বানাবে বাঁসে, ভেঙে যা ছড়িয়ে দিলে আঁজ।

এ সমুদ্রে ঢেউ নেই। জানালায় টুকরো আকাশ
কতোটুকু ! তবু মন এখানেও বাঁচে—কথা বলে।
সামান্যের ধূপে জ্বলে অসামান্য পাওয়ার সুবাস
নিঃশব্দ আমার ঘরে। দোলনায় ছোটো শিশু দোলে।

তিন

এই তো বসন্ত, প্রিয়তম। সারা বছরের দেনা
একটি ফুলের অর্ধো শুধাবে সে—কিছু শুধাবে না।

কবিতা

ষাশ্বিন ১৩৫২

পিছনে চেয়ো না কিরে । সেখানে মেঘলা দিনে, রোদে,
পূর্ণিমায়, অন্ধকারে—কী দেখাবে ? জীবনের হৃদে
কতো জল—কী চঞ্চল ! অজ্ঞানিতে যা ওঠাবে, তার
রূপ নেই, মানে নেই । মানে আছে এই মোহানার ।
এ-মিলন—এ-সংগম—এতে আছে সমুদ্রের স্বাদ ।
পিছনের কথা তুমি আচ্ছাদে কি করবে বিবাদ ?

চাঁর

যে-রাত্রিতে তুমি নেই । তার সব আছে ।
আছে বটে, নির্জন ঘণ্টার সঙ্গী । জানালার গলা কাঁচে
আলোর নিস্তাপ হাসি । ডেসিং-টেবিলে আয়নার
যত্নোচিত চেয়ে দেখি—ক্লান্ত চোখে মেয়েটি তাকায় ।
সেনায়ে গঠিত সূচী । খোকাখুকু ঘূমের অতলে ।
কালের উদ্বিগ্ন বাক টিকটিক পেতুসম দোলে ।

সব আছে । তবু যেন কিছু নেই । ছেয়ে সারা ঘন
একটি উৎকণ্ঠা শুধু—ঘন্টি বেজে উঠবে কখন ?

কবিতা

আদ্বিন ১৩৫৩

ছটি কবিতা

সুশীলচন্দ্র সরকার

চিল : মেয়ে কবি :

১

পেছনে ডাঙায় খাঁড়া তোলে মেঘ,
সামনে ঝাঁড়োয় ঢেউয়ের পাঁচিল,
এমন সময় কিনারে সরিয়া

ডানা ঝলসাস কেন গাঙ-চিল ?
বুকে হঠাতের যদি থাকে চৈল।
ভরসা-শফরে গিয়ে মর আগে,
নয় তো ফিরে যা। সুন্দরীর ডালে
ভয়ের মোতাবে নথ আঁচড়া গে :--

বাচার মোড়ে এ কিসের ত'য়ের ?
—‘নতুন ছোঁয়ের—নতুন ছোঁয়ের !’

২

কাপছে জোনাকি-শঙ্কিত ঘর,
‘ফিরে এসো’—কয় নিরামা চাতাল,
নীচে বেপরোয়া উদ্দাম পথ

মন-মহুয়ার গন্ধে মাতাল।
কে তুই পথিকা—হাওয়া উথলোয়
আঁচলে খোঁপায় বুক-উচাটনে ?
যা মেটা পিয়াস ঘরোয়ায়—নয়
ভিটে ছিঁড়ে বর ঝড়ের উঠোনে।

ভুঁ দোটানায় পারি ফল কোনো ?
‘—আরে। শিউরোনা—সেরা শিউরোনা !’

কবিতা

শ্রাবণ ১৩৫২

৩

শহিয়ে জগৎ টাল সামলায় .
আকড়ে জমাট নক্সা বাজার,
কাছেই ছ'টার বৈরাগী জুটে
পোড়োয়ায় ঢেউ মূঠি ছাড়াবার ।
কে ভুট্ট এখানে ? কাদাবালিজলে
এলি বাঁধ দিতে কিসের আশায় ?...
...কিছুখন তোর তারকা-সুচল,
কিছু বা সাগর কাড়ে কুয়াসায় ?...
ডুব ভেসে, কবি, বল পাৰি কারক ?
'—নতুন আশারক, নতুন ভাষারক !'

কৈচো চেয়েছিল

কৈচো চেয়েছিল মাটিকে জানতে ।
খানা খেত খাল খন্দ খোঁদলে
লুটিয়ে মাটির দেহলি-প্রান্তে,
কৈচো চেয়েছিল মাটিকে জানতে ।

পাখুরে, দো-আশ, বেলে ও এঁটেল
কত টিল ঢেলা দেখেছিল ঠেলে ।
চুক পড়েছিল শত সূড়াস
নীচের খবর উপরে জানতে ।

কবিতা

অগ্নিনি—১৩৫৯

তুকানো ধুলার অস্থখে সে ধূঁকে
আরো সেঁধিয়েছে মাটি-মার বুকে,
মেতে বেড়িয়েছে বর্ষা-বাদলে
কাদায় শরীর টানতে-টানতে ।

পেল না মাটিকে কাদায় গড়িয়ে,
পাক গিলে, মেখে, আঁকড়ে জড়িয়ে
তখন মাটির দানার ধাঁধাকে
শরীরের রসে চেয়েছে ভানতে ।

শেষ ম'রে গেল । মাটির নাটের
ভিতরে কী পালা পেল না তা টের :
মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে মিশে
গেল কি মাটিকে সালিশি মানতে !

কবিতা
ষাধিন ১৩৫২

চিত্রলেখা

অশোকবিজয় রাহা

১
দিগন্তে আকাশ উড়ে-যাওয়া
চারদিকে ধূ-ধূ মাঠ, হাওয়া
মাঝখানে সবুজের ভিড়
পাখি-ডাকা নৌড়
প্রাণের গুঞ্জন
শান্তিনিরুত্তরন ।

লাল পথ, শালবীথি, সোনালি সকাল
জাহ্নবীর শিল্পীর খেয়াল,
রঙের ফোয়ারা ছোট্ট গাছের মাথায়
রং করে পাতায়-পাতায়
আকাশের গায়
রেখা টেনে পাখি উড়ে যায় ।

বকুলবীথির পাশে আরেক জগৎ :
রামধনু-পথ ;
লাল নীল জাহ্নবানি শাড়ি-পরা মেঘের মেয়েরা
করে ঘোরাকেরা
পিঠ-ভরা এলোচুল চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক
কানের সোনায়ে ঝিকমিক ।

কাব্য

আশ্বিন ১৩৫২

শিরীষের ডালে-ডালে ঝিলমিল হাওয়া
নাচে ছাড়-পাওয়া,
আলোর খুশির মতো একভিড় ছেলে
পথ দিয়ে বেরিয়েছে ঠেলে
হাসির বর্না খুলে ওদিকে মেয়েরা সব আসে
ঘণ্টাতলার ঐ পাশে ।

আজকে ছুটির দিন, তাই
মাঠে এসে মিলেছে সবাই
হাসি-কোলাহলে
ছেলেমেয়ে দলে-দলে চলে
কেউ-বা পারুলডাঙা, কেউ-বা কোপাই ।

২

তপুর ঘনায়
গাছপালা রোদে বলসায়
পথের ছ'পাশে
ছায়ায় এলিয়ে পড়ে ঘাসে
শূন্য আমবনে
তলস মোমাছি ফেরে পাথার গুঞ্জে ।

হঠাৎ চমকে চোখে পড়ে
ছায়াগুলো বৃকে হেঁটে নড়ে
স'রে যায় গাছতলা হতে
শানবাধা বেদীগুলো আধখানা রোদে ।

কবিতা

শ্রাবন ১৩৫২

শিউলিবীধির পথে একটি নির্জন মেয়ে যায়
কাঠবিড়ালিটি চমকায় ।

বিকেল গড়ায়

গাছে-গাছে সাড়া পড়ে—উকিঝুঁকি পাতায়-পাতায়
দিকে-দিকে ছায়ারা দাঁড়ায় :

কোনো ছায়া চিতাবাঘ, কোনো ছায়া কালো

কারো গায়ে ডোর-কাটা আলো

কোনো ছায়া কণা-তোলা সাপ

কোনো ছায়া মেলেছে কলাপ

শালবীধি-পাশে চলে পায়ে-পায়ে মিল

চাঁতির মিছিল ।

৩

শাওয়া শনশন্

ছুটে যায় মোমাছি বন

যেখানে হরিণ পথ, আমলকী বন

যেখানে গাছের ভিড় হঠাৎ থমকে আছে মাঠে

ঘাসে ছ'টি খঞ্জন হাঁটে

যেখানে পথের পাশে

বেজিটি ত্রুস্ত ছুটে আসে

রোদ মেখে গায়

একটু দাঁড়ায়

ঘাড় তুলে চারদিকে চায়

আবার লুকায় আসে

ঘাসে ।

কবিতা

শাখিন ১৩৫৯

রোদ-ভরা ঝাঁকা মাঠ বিষণ্ণ উদাস
শরবন ফেলে দীর্ঘশ্বাস ।

৭

কোথা নেই সাড়া
হঠাৎ সময় খাপছাড়া
দূরে ছ'টি ভালগাছ খাড়া
বোবার পাহারা ।

ঘুরে-ঘুরে দিন কাটে
বিকেলের সূর্য জ্বলে মারে
আগুন ছড়ায়
হিনঝরি-গাছের মাথায়
বাস-পাতা জ্বলে ওঠে হঠাৎ অদ্ভুত আলোয় ।

দূর-মারে করে রং-ধূলি
ছোটো-ছোটো ছেলেকেয়েগুলি
মেতেছে খেলায়
রঙিন পাপড়ি হয়ে সারা মাঠে হাওয়ায় ছড়ায় ।
সূর্য-গলা মেঘে
উঠেছে রঙের ঝড় জেগে
ছুটেছে আলোর নদী ঝাঁকাঝাঁকা আগুনের ধারা
আলোর আতশবাজি ছোটায় ফোয়ারা
ফেটে পড়ে সাল নীল তারা ।

কবিতা

শাশ্বিন ১৩৫২

প্রেম-প্রিয়া

সত্যজিৎ বসু

আকাশে প্রত্যাশা-লিপি স্বপ্নিকা উষার মন আঁকে ।
তেমনি এ মদামসা পৃথিবীর পৃথুলতা তামসী মতাকে
ডেকে আনে, কানে-কানে কয় সেই ছায়া-দূতিকায়ে
“সই, শোনা, কোনো ছাতি নেই যার নারায়ণ তাকে
নেবে কি, নাবিক তার নৌকার বিলাসে
ফেলে নীল আকাশের ফেনিল উষার যুথিকারে ?
রবি-প্রিয়া পূরবিণী জানি তার সুরভির গ্রাসে
অনিরুদ্ধ সূর্য নারায়ণ, বলো, সে কি চেনে দ্রাবিড়-কণ্ঠ্যকে ?”

চেনে । তার নাম তুমি জানো না, মেদিনী ।
যেদিন তোমার বুক কামনার কামিনী-স্তবক
ফুটেছিল, তারো মনে হৃদযাত্ৰা কিংক-জবক
অশোক-পলাশ বৃক্ষ অশ্রুমনে ফুটেছে সেদিনই ।
সেই নর-নারায়ণ তাম্রবর্ণ, তাম্রপর্ণে লেখে
তোমার প্রথম নাম, প্রেম-প্রিয়া, প্রেমেরে ভোলে কে ?

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

চীনে কবিতা

অনুবাদ—দিলীপ দত্ত

(ওষেং ওষেই ৬২২-৭৫২ খৃঃ)

১

বিরাত পাহাড়টায় জনমানবের চিহ্ন নেই
অঞ্চল মানুষের কণ্ঠস্বর অবিশ্রান্ত ভেসে আসে
ঘন বনে প্রতিচ্ছবি পড়ে দূরদিগন্তের
সূর্যের আলো লেগে ;
আর সবুজ ঘাসে আঁকা হয়
রঙিন কত আলপনা ।

২

গ্রাম থেকে এসে
বলো না সেখানকার খবর ।
যখন এলে, শাদা জানলার তলায়
কৃষ্ণকলি ফুটেছিল কি ?

৩

তুমি পাহাড়-পথ বেয়ে নেমে গেলে,
সূর্যের অস্তগামী আভায় বাগানের দরজা
বন্ধ ক'রে দিলাম,
বসন্তে ঘাসগুলো আবার সবুজ হবে
কিন্তু এ পথিক কি আর ফিরে আসবে ?

কবিতা

আবিন ১৩৫২

৪

সাজে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই পীচফুল আরো লাল
মকালের কুয়াশায় উইলো গাছকে আরো সবুজ দেখাচ্ছে,
ঝ'রে-পড়া পাপড়িগুলো এখনো চাকর এসে ঝাঁট দেয়নি,
পাখিরা গাইছে গান, পাহাড়ের ওপর আমার অতিথির
এখনো ঘুম ভাঙেনি।

৫

অসমভাবে হেঁটে চলেছি দুজনে
দেখলুম শিউলি ফুল ঝ'রে পড়েছে
রাতের নিস্তর্রতায় ;
পাহাড়টা জনহীন,
চাঁদ উঠেছে, পাখিরা মচকিত হয়ে ওঠে
আর ঝরনার পাশের গাছ থেকে মাঝে-মাঝে
গান গায়।

৬

হিমশীতল পর্বত আরো ঘন সবুজ হ'য়ে আসে।
শরতের নদী ব'য়ে চলে গুনগুন গান গেয়ে।
বাগানের দরজার পাশে ঘাসের আঁটির ওপর
হেলান দিয়ে শুনি
শ্রবল বাতাসের মাধ্যমে দিয়ে ভেসে-আসা
বৃক্ষ ঝিল্লির কান্না।

কবিতা।
আশ্বিন ১৩৪৯

ছটি কবিতা

অসীম দ্বার

ভোর আসে

অন্ধকারে
ফিনকি-দেওয়া আর্থনাদে
বৃষ্টিতে কাদায়
প্রতীক্ষায় ক্ষরদগ্ধ চায়ের উলুনে
অস্থির হাওয়ায়
ভোর আসে।

তোমার দেহের ক্ষতে একঝাড় উজ্জ্বল গোলাপ
ফুটে আছে,
তোমার রক্তের গানে সারারাত কেঁদেছে পাহাড়।

কেউ যায় তরতর ভেসে
পাতার নৌকায়,
তুমি একমনে
পাথর ভাসাও।

তোমার আমার রক্তে
তোমার আমার কান্নায়
ভোর আসে।

অন্ধকারে
ফিনকি-দেওয়া আর্থনাদে
বৃষ্টিতে কাদায়
ভোর আসে,

মায়ের বোঁটায় দুধ আসে,
সূর্যের আরক্ত ফুল মেঘের গলায় ।

তুমি শুয়ে আছে

তুমি শুয়ে আছে
চৈত্রেয় হাওয়ায়,
বাইরে জানলায়
কৃষ্ণচূড়া, ভিখিরির পাল,
পড়ন্ত রোদ্দুরে
ফুলের শিরোপা
পার্কের বড়ার মাথায় ।

তুমি যে ছেলেকে চাও সে তোমার ওষ্ঠের বাহিরে
কাদা মাখে,
মুখে তার কনক কিরণ ।
অন্ধকারে
নিশ্বাসের স্বর
যেন আসে
সমুদ্রের পার হতে ।

তুমি শুয়ে আছে
চৈত্রেয় হাওয়ায়
আগুনের অলস পাহাড় ।

কারা গান করে
খাড়াই রাস্তায়,
বিছাৎ চমকায় চুলে ।

দুর্মর

গুণেন্দ্র ভট্টাচার্য

যদিও দুর্মর আমার প্রাণ
চরবগাহ ভয়—উধ্বাস
মৃত্যু-হাহাকার কচিং পাই
বিকলে বেতারের ক্লাস্ত গান,
শহরে ভিড়, ট্রাম-বাসেও তাই,
আকাশে মরা চাঁদ, হৃদয়ে ঘাস।

শপথ মানানাম তীক্ষ্ণধার
দীপ্ত জীবনের কাস্তিহীন
মৃত্যু চাটে নাটে যেহেতু, তাই
তীব্র বেদনায় প্রতীকার
আয়ুধ বানানাম, মৃত্যু নাই
আমার হৃদয়েই এ-হৃদিনে।

মৃত্যু নাই, তাই যারা কান্দে
তারাই সাহসেই কবে খারিজ
করবে কান্নাকে, কবে তারাই
আশায় বুকে বুকে পাশাণ বাঁধে,
তাদেরও শপথের শাপিত ধার
হবে প্রতীকার আয়ুধ, তাই
তাদেরও সম্মুখে মৃত্যুবীজ
উধাও, দুর্মর তারা আমার।

কবিতা

শ্রাবণ ১৩৫২

কঙ্কাবতীর ঘাটে কিংবা ময়নাপাড়ার মাঠে

অনন্দ বাগচী

দিশারী-উষারি কঙ্কণ-পরা হাতে তুমি
হাতছানি দাও তল্লা-ত্পুর কালো রাত্রে,
আকাশ এখন অবাক-তারার কুমকুমি
জোনাক-পোকারা স্বরলিপি লেখে আলো-হাতে ।

জীবন করোলো গল্প করোলো কই না তো !
কাঁটার দেমাকে বেঁচে আছে আচ্ছা নটে গাছ
গালে হাত দিয়ে গল্পটো শুনি আমরা তো,
জীবনে এখন সুরু যরণের পুচ্ছ-নাচ ।

আজকে তোমার পদ্ম-দীঘির ঘাটভাঙা
ঘাটের সোপান ঘিরেছে পিছল শ্যাওলাতে
আজকে কথার কিচিরমিচির নেই...ডাঙা
ডুবে গেছে, তুমি একদা পাড়ছ কার হাতে ?

তোমাতে আমাতে পরিচয় ছিল কানে-শোনা,
কঙ্কাবতী কি ময়নামতীর ঘাটে-মাঠে,
মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে এখন গানে-বোনা,
বাসর-বিতানে রূপকথা আচ্ছা পথ ঠাঁটে ।

কবিতা

শাশ্বিন ১৩৫২

নিভৃতি নেই তো এই মনে তবু এতটুক
মাথো চিন্তার নির্জন গিঁট খুলে চলি,
কবোকা বৃকে থেকে যাও বাকি রাত্রিটুক
সূর্যকলি ও কক্কলিতে কোলাকুলি !

আবার সকালে সূর্য উঠবে সরাসরি
নিমেষে নিমেষ হবে এ-প্রোমের অবসর,
সব সস্তাউ যাবে শস্যায় ছড়াছড়ি,
কোথায় দেখছি মনে নেই—তবু স্বপ্নাদয় !

কবিতা।
আবিন ১৩৪২

একটি মরম শব্দ

শ্রীমৌলিকুমার মল্লী

আশ্চর্য নরম দিন। ভাত্তরের সকালে
সন্ধ্যা মেঘের ফ্রেমে ভিক্রোনা আকাশ
চুঁয়ে-চুঁয়ে স্নান হৃদয়ের মতো সোনালি রৌদ্রের শিথ স্বপ্নের আভাস
নির্জন সমুদ্র-বৃক গিয়েছে ছড়িয়ে
আবার। তাই'লে বৃষ্টি ফিরে এলো যে-স্বপ্ন হারিয়ে
গিয়েছিলো ঘনকালো শ্রাবণী মেঘের শাড়ি-আঁচল-আড়ালে !

বেলা বাড়ে। তার সাথে ডুবুরির বাস্তব কোলাহল
দেখা দেয় সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রশান্তি ভেঙে ঢেউয়ের অতলে
খুঁজে ফেরে উত্থিত মুক্তার সন্ধানে সুপ্ত ঝিনুকের কোলে
অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে। উজ্জল স্বপ্নেরে
এ-ভাবে অপূর্ণ রেখে সমুদ্র-শিয়রে
কী হবে ঝিনুক খুঁজে ? তুমিও হৃদয়
অবুঝ হোয়ো না, শোনো, প্রখর রৌদ্রে নাওয়া নতুবা বৃষ্টিতে ভেজা
অনেক সময়
ফিরে পাবে, আর পাবে হয়তো বা ঝিনুকের বৃক মাথা
সমুদ্রের সোনা।

পাবে কি, পাবে কি তবে এই ভীক সোনা ?—
সমুদ্রের রাত্রি ঘন আধারে বিলীন

কবিতা

ষাশ্বিন ১৩৫৯

একবার হয় যদি, তারপর অশ্রু কোনোদিন
এ-ধূ ধু সমুদ্রে আর হয় তো বা বোনা
হবে না। তাই তো বলি
চেউয়ের শিখর থেকে নরম স্বপ্নের এই ছ-একটি কলি
তুলে নিয়ে স্মৃতির কোমল বুকে নিষ্ঠুর ছবির মতো বাঁধিয়ে রাখো না।

কবিতা
আব্দিন ১৩৫২

বন্দী-খাম

(বৃত্ত, কবিতার উদ্দেশ্য)

লোকনাথ অষ্টাচার্য

অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
আগুন নেভে আর জলে—
বন্ধ দ্বার হ'তে বন্ধ দ্বারে
বন্দী চলে দলে-দলে ।

আমার মন অভিযন্ত বন,
বন্ধ্য। মোহাগে সে মহাস্থবির—
আজকে যেতে চায় চঞ্চলের
চকিত চাহনির দীর্ঘ তীর ।

আকাশ যেন এক পাষাণ শতদল
হবে না দৈত্যের দুর্গজয় ?
প্রাচীর পার হ'লে বিপুল বেদনার
লক্ষ বিবসনা অগ্নিময় ।

যেদিন নিভে যাবে আগুন, কার জ্বর
অসহ সন্তোকে বিলম্বিত
বিরিট যোনি তার জন্ম দেবে লোক
লোকাস্থর কত তিমিরাবৃত ।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

গভীর ধৈর্যতে সুদূর কাস্তানে
সেখানে হীরামন যে-গান গায়—
হারানো কূল এই হৃদয়ে, হৃদয়ের
মরণ-জোয়ারের ধ্বনিতে ছায় ।

রক্ত নেই, উষা নেই কোথাও, পথ
চলেছে তবু, আর চলেছে মন
বহুর চেতনায় হে তুমি চিন্ময়,
তোমায় অন্ধায় আলিঙ্গন ।

নিথর রাত, নীল নিবিড় মদ,
হয়তো ঝড় চেনে অন্তরাল—
হঠাৎ বিছাতে চমকে চায়
অতীতে হিজিবিজি-আকা দেয়াল ।

অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
আগুন নেভে আর জ্বলে—
বন্ধ দ্বার হ'তে বন্ধ দ্বারে
যাত্রী চলে দলে-দলে ।

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

সম্ভাষণ

নরেশ গুহ

ওরে ভীক, ওরে পরম অবিদ্বাসী,
এখনো তোমার জাগলো না প্রত্যয় ?
হৃদয় তোমার এখনো দিলো না সাড়া ?
দেখলে না তুমি রাত্রি রয় না খাড়া
প্রভাতে কালো পাহাড়ের মতো ? যেট
আকাশ পেয়েছে আলোর স্রোতের খেঁচ,
দশদিক যেট গেয়েছে দিনের জয়,
যখন সংশয় স্বপ্নের মতো বাসি,
তবু পোহায় পোহায় না তব ভয় ?
ওরে ভীক, ওরে পরম অবিদ্বাসী !

জীবন তোমাকে শেখায় নি কোনো গান ?
মৃত্যু জানেনি কোনো অভাব কেন ?
ঘাতক সময় কুঠারে দিয়েছে শান
দিনরাত শুধু তোমাকেই ভেবে ? প্রেম
কোনো অসময়ে, প্রভূত ক্রেশের শেষে,
তোমার তপ্ত কপালে রাখেনি হাত ?
বিকলে যখন সঙ্কারণ ছায়া মেশে,
সব কালো চোখে কাজল পরায়ে রাত,
তৃতীয়ার টাঁদ উঠে আসে নীলিমায়,
নীলবে ঝরায় প্রভু বুকের হাসি,
বিশ্ব তখনো তোমার অন্তরায় ?
ওরে ভীক, ওরে পরম অবিদ্বাসী !

কবিতা
আশ্বিন ১৩৪২

বোদলেয়ার অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

একমাখা চুল

চুল ! চুল ! কঠোর প্রাক্ত ছাপিয়ে উপচে-যাওয়া, ফেনিয়ে-পড়া, ঝাঁকাঝাঁকা !
কৌকড়া চুল ! আলস্তের আত্মাণ ।
উন্মাদ আনন্দ ! আত্ম সজ্জায়, এই কুঙ্কলের গুচ্ছে-গুচ্ছে ধূমিয়ে-থাকা
স্বতির ভিড় ন'ড়ে-চ'ড়ে বেগে উঠুক, ফিরে পাক প্রাণ,
আমি তাদের ক্রমালের মতো হাওয়ায় নাড়ি, আকাশে উড়িয়ে দিই তাদের
উল্লাসের পতাকা ।

এশিয়ার দীর্ঘ মহর শৈথিল্য, আফ্রিকার জলন্ত অবসর,
আন্ত একটা পৃথিবী, সুদূর, অসুপস্থিত, প্রায় লুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক,
তোমার চুলের গভীর সুরভি অরণ্যে আবার বেঁচে ওঠে, তোলে
দুরন্ত মর্মর ;—

আর আমার আত্মা, হে শ্রিততমা, তোমার গন্ধের ঝাপটে-ঝাপটে উড়ে যায়
দিশিদিশ
ভাসিয়ে দিয়ে, যেমন অন্তদের আত্মা গানের পাল তুলে ধরত ।

যাবো আমি সেখানে, যেখানে গাছ আর মাহুঘ, প্রাণের সবুজ যজ্ঞায় উজ্জল,
ধীরে মুছিত হ'য়ে পড়ে তীব্র সংরক্ত আবহাওয়ায় ;
হে বলীয়ান অলকদায়, হও সেই নিহু-দোল, যাতে আমি উত্তীর্ণ হবো উত্তরোল
সীপান্তরে !—রাখো তুমি, আবলুশের সমুদ্র আমার, সেই উজ্জল
অগ্নির স্রোত, যান্ত্রিকের, নাবিকের আবেগে ভরা, আর আকাশের
আন্তনের হলকায় :

মুখর বন্দর, যেখানে বড়ো-বড়ো ডরদে
উঠছে শস্য, বর্ণ, গন্ধ—আগার আত্মার আকণ্ঠ পান !

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

যেখানে নানা দেশের আহাচ্ছ, সোনা আর তরলিত রেশমের উপর দিয়ে
মহন গতিভঙ্গ

চলতে-চলতে বিশাল বাহু মেলে দেয় সেই স্বচ্ছ, মহান
অপরিমাণ নীলিনাকে চুম্বন করতে, যা বাহুত উত্তাপে বেপথুমান।

উদ্ভাদনাই আরাধ্য জেনে আমার গাভাল মাথাটা দেবো ডুবিয়ে
এই কালো, কালো মহাসমুদ্রে, অন্তটি বন্দী আছে ঘর তলায়,
আর আনার স্বপ্ন সত্তা, ডেউ-দোলার আদরে-আদরে গ'লে গিরে
চিনে নেবে পথ, খুঁজে পাবে তোমাকে, যাবে তোমারই মনো মিলিয়ে—
হে অমৃতঃসত্তা আলম !—চন্দনগন্ধী অবসরের অকুরন্ত দোলনাঘ।

— নীল চুল, অন্ধকারের বারান্দা আমারই দিকে বাড়ানো,
তুমি নীল ক'রে নিলে আকাশ, মস্ত বড়ো গোল ক'রে দিলে আমার
নীলিনাকে : তোমার চূর্ণালক, পালকের মতো রোমনা, কৌকড়ানো,
তার প্রান্তে এসে ক্ষুদ্রিতের মতো ছুনিবার
মাভাল হ'য়ে ঘাই মিশোল গন্ধে—নারকোল জ্বেলের, মৃগমাভির
আলকাংরার।

অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে ! চিরকাল, চিরকাল ধ'রে ! তোমার পীন ঘন
কেশরের মধ্যে, অধীর

হাতে আমি ছড়িয়ে দেবো লাল চুনি, মুক্তো, আর সবুজ
পাখা রান্নি-রান্নি, যাতে আমার বাসনার চীৎকারে আর বধির
হ'তে তুমি না পারো !— কেননা তুমি তো সে-ই, আমার স্বপ্ন দেখার
মরুজান, সেই আশ্চর্য তরমুজ,

যা থেকে বিরাট টোকে-টোকে স্বতির স্রা গিলে আমি মদির !

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

শব্দ

কী আমরা দেখেছিলাম সেই গ্রীষ্মের প্রসঙ্গ
সুন্দর সকালবেলায়, হঠাৎ রাত্ৰায় মোড়ে
পাথর-পাতা বিছানায় একটা পতঙ্গ শব্দ, গলিত, অস্পষ্ট,
ঋতু, তোমার মনে পড়ে ?

পিচ্ছিল বমনীর মতো, শূন্যে পা ছুটি তুলে,
ভাপে, ঘামে বিষ পড়ছে চুঁইয়ে,
তার বস্তু প'চে-যাওয়া দুর্গন্ধ উদর দিচ্ছে খুলে
চক্ষুসজ্জা খুঁইয়ে ।

এই যিনযিনে ঘাঙলোকে যেন রাস্তা করবে বলে
রোদ্দুর ঝরলো তার উপরে,
টুকরো ক'রে ভেঙে-ভেঙে ফিরিয়ে দেবে পরম প্রকৃতিকে, যা স্ফকোণলে
তিনি মিলিয়েছিলেন এক ক'রে ;

আর এই চমৎকার শব্টি, আকাশ দেখলো চোখ মেলে,
ছুটে উঠছে ফুলের মতো ।
এমন দারুণ দুর্গন্ধ বে ছুমি দরতো ভেবেছিলে
অজান হ'য়ে পড়বো না তো ?

বসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি সেই পুষ্টিহীন উদরে, যেখান থেকে
কালো-কালো অক্ষৌহিনী কুমি আসছে বেরিয়ে
ঘন ঘোতে, ময়লা জলের মতো এঁকে-বেঁকে
তার জ্যান্ত নাড়িহুঁড়ির প্রাস্ত দিয়ে ।

কবিতা

আগ্নিন ১৩৫৯

এই সমস্ত উঠছে আর পড়ছে, যেন ঢেউয়ের ছন্দে,
কিংবা ন'ড়ে উঠছে হঠাৎ স্পন্দনে,
দেখে মনে হ'তে পারতো এই শরীরটা, যেন নিখিল নিবাসে ভরা, মহানন্দে
বেঁচে আছে তার এই প্রজ্বলনে ।

আর এষ্ট অগ্নিটা থেকে অদ্ভুত স্বর পড়ছে ছড়িয়ে
স্রোতের মতো, হাওয়ায় মতো স্বরে,
কিংবা যেন ধান ডানার ছন্দ, যখন ললিত হাতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে
কুলো থেকে ফসল তোলে ঘরে ।

রূপ, গড়ন ঘুচে যায়, হ'বে যায় স্বপ্ন সুনশান,
নকশা ফিরে আসে না সহজে
ভুলে যাওয়া পটের উপর, কিন্তু শিল্পী তাকে ফিরে পান
স্বতি, শুধু স্বতির গরজে ।

বাধের পিছন থেকে একটা লোগ-ওঠা
অধীর কুকুরী, রাগি চোখে
লক্ষ্য করছিলো আয়ানের—কখন ফিরে পাবে তার ফেনে-আসা টুকরোটা
ঐ কঙ্কালের ফাঁকে ।

—আর তবু, তুমি—তুমিও হবে এই পুরীষের প্রাচুর্য,
এই দাক্ষণ দুর্গন্ধ,
তুমি, আমার চোখের তারা, আমার সন্তান স্বর্ষ,
আমার দেবী, আমার আনন্দ ।

হ্যা, তুমিও তা-ই হবে, সৌন্দর্যের রানী আমার,
যখন, শেষ মন্ত্র পড়া হবার পরে,
তুমি পচবে হাড়ের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে, আর মোটা-মোটা ফুলের দাহার
গন্ধিয়ে উঠবে তোমার দুর্গন্ধের উপরে ।

কবিতা

আব্দিন ১৩৫৯

তখন, প্রিয়তমা, তোমাকে চুমোয়-চুমোয় ভোজন করবে যে-সব কৃষি,
এ-কথা তাদের বলতে তুলো না,
যে আমার ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে দেখেছি আমি,
দেখেছি তার আকৃতি, তার স্বর্গীয় নির্বাস, তার ছলনা।

আলবার্টস

মাকে-মাকে, কোতুকের খেয়ালে, জাহাজের যাব্দিমাত্রা
ধরে সেই বিশাল সমুদ্র-পাখি, আলবার্টস,
জাহাজের সঙ্গে, লোনা জলের তিক্ত তরঙ্গে, যে পাল্লা
দেয় সাত-সাগর পার হ'য়ে, আকাশে পাখা মেলে, অলস।

যখনই তাকে ডেকের উপর রাখলো ওরা।
তখনই এই নীলিনার সম্রাট, লক্ষ্য পেয়ে, থতোমতো,
ছেঁচড়ে চলে বিশাল শুভ্র কক্ষ তার ডানাজোড়া
ডাঙা দুটো নাকেরহাল দাঁড়ের মতো।

এই আকাশযাত্রী, কী দুর্বল সে হ'য়ে ঘাব, ঘাব দাপটে
যেহে ছেড়ে দিতো পথ! একটু আগেও এত যে হৃদয় ছিলো,
কী কুংসিত এখন, অবড়জং,
কেউ হুকোর নল দিয়ে শুড়শুড়ি দেয় তার ঠোঁটে,
কেউ বা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নকল করে তার ডাঙার চলা বেয়াকুব ঢং।

কবিতা তা-ই, যেমলোকের রাজপুত্র, শিকারীর তীর
হাসিতে খানখান ক'রে দিয়ে ঝড়ের বুকে তার আনাগোনা,
এই পৃথিবীতে নির্বাসিত, যেখানে ব্যস্ততা, চীৎকার, ভিড়—
তার বিরাট ডানা নাখা দেয় তাকে, তাই চলতে পারে না।

কবিতা
আশ্বিন ১৩৫২

সমালোচনা

উত্তরবঙ্গ, শ্রীমৃণালকান্তি । কবিতাভবন, ১।০
অশ্রম ও শ্রম, সঞ্জয় ভট্টাচার্য । পূর্বান, ১২
দিনেশ দাসের কবিতা, শিবদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

পাণ্ডুলিপি, ২।০

যেঘরুষ্টিবড়, মললাচরণ চট্টোপাধ্যায় । কাব্যকোণ, ১।০
সমুদ্রকন্যা, মৃগাঙ্ক রায় । সারস্বত লাইব্রেরি, ১।০
সায়ান্ন, অরুণ ভট্টাচার্য । ভারতী গ্রন্থভবন, ১২

বাংলা কবিতার দুটি ধারা পাশাপাশি চলছে আজকাল । তার একটি শান্ত, কোমল, বিরহব্যথিত, দীর্ঘশ্বাসে ভরা ; অশ্রুটি চকল, একটু কড়া মেজাজের, দুঃখকষ্টের পরপারে একটি অনড় আশাহ আশ্রিত । একদিকে অস্তুমুখিতা, স্বগতোক্তির গুনগুন স্বর, অশ্রুদিকে দশজনকে ডেকে চেঁচিয়ে বলার মতো আওয়াজ । আমি অবশ্য এমন কথা বলছি না যে এ-দুটোকে একেবারে আলদা করে নেয়া যায়—সাহিত্যের, বা জীবনের, কোনো ক্ষেত্রেই তা সম্ভব নয়, যে-কোনো দুই বিভিন্ন ভাবে পরস্পরে কিছু মিল-মিশ থাকেই, মাত্রার তারতম্য অনুসারেই আমরা শ্রেণীভেদ করে থাকি । কিন্তু কোনো-কোনো কবিতাে সেই মিশেলটুকু পাওয়া যায় না, তাঁদের বলতে পারি সাহিত্যের অধৈতপন্থী । এই রকম কবি 'উত্তরবঙ্গ'র লেখক, যিনি 'মৃণালকান্তি দাস' থেকে সম্প্রতি শ্রীমৃণালকান্তি-তে রূপান্তরিত হয়েছেন । তাঁর রচনার ধরনটি কী, তা তাঁর যে-কোনো বইয়ের যে-কোনো পাতা খুললেই তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে, তাঁর একাভিমুখী বিভিন্ন বইগুলোর মধ্যে অদল-বদল চলে যেন । আধুনিক জীবনের বিচিত্র মিশ্রিত কলরোল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, মৃণালকান্তি যেন একতারাঘ একটি কল্পন মূহু বিষাদের স্বর বাজিয়ে চলেছেন । এই স্বরের অশ্রু তৈরি কান অনেককেই হয়তো হারিয়ে ফেলেছেন আজকের দিনে, কিন্তু যারা বাস্তবতার কানকে খমকে ঠাড়িয়ে কান পাতবেন

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

ভাঁষের ভালো লাগবে সন্দেহ নেই, মুহূর্তের ক্ষণ শান্তির স্পর্শ পাবেন তাঁরা। 'উত্তরবঙ্গ' লেখকের সর্বতোভাবে লক্ষ্যযুক্ত গ্রন্থ, গল্প-পড়ে ছোটো-ছোটো লিটিকের মালা করে গাঁথা, সারা বইটার লেখক যেন আপন মনে কথা বলে চলেছেন, আমরা আড়ি পেতে শুনি। শেষের দিকের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে যাবে-যাবে, কখনো কোনো রেখাচিত্রে চীনে কবিতার আমেজ দেয়, আর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে—অকৃত-আমার মনে পড়েছে—'কবিতা'র প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বছরে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বাগচীর 'গীতিগুচ্ছ', যার চেয়ে ভালো কবিতা ঐ কবি কখনো লেখেননি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যা বই হ'য়ে কখনো বেরোলো না, আর এতদিনে ক-জনই বা মনে রেখেছে। বাংলা কবিতার নিরাভরণ অস্তরঙ্গতার শিল্পী ধারা, তাঁদের মধ্যে আজকের দিনে যশালকান্তি উল্লেখযোগ্য, অথচ কখনো-কখনো তাঁর রচনায় স্নান একটি বাক্যের আভাসও পাওয়া যায়, যদিও সেই বাক্যও তাঁর স্বাভাবিক মেহুরতা থেকে বিচ্যুত নয়।

এক বলক সোনালি রৌদ,
উদাসীন ছপুয়ের চিল,
মৌমাছির অলস গুপ্তন
বেঙনি ঘাসফুল—
এর চেয়ে কি সুন্দর,
সেই রংকরা রাজবাড়ি।
বে-কলনার তুমি
ক্রান্ত, ধূসর।

'বে-কলনার তুমি ক্রান্ত, ধূসর'—এই খোঁচাটুকু বিশ্বের চমক দিয়ে যায়।

এই বিবাদ, এই দ্বিধা ভাবন, হৃদয়ের স্পর্শ, এ-সব সঞ্জয় ভট্টাচার্যেরও চরিত্রলক্ষণ। তাঁর কবিতার সঙ্গে আজ বহুকাল ধরে পরিচিত আমি, এবং এ-কথা বলতে আমার একটুও বিধা নেই যে বিগত লিটিকের ক্ষেত্রে অনেক স্মৃতি তাঁর জ'মে উঠেছে, যদিও তাঁর প্রাপ্য সম্মান আজ পর্যন্ত তিনি পাননি। 'প্রেম ও অপ্রেম' নামক তাঁর নতুন বইটিতে, স্নেহের বিষয়, অপ্রেমের চাইতে প্রেমের অংশট বেশি। অপ্রেম ছায়া ফেলে জীবনে; 'আমাদের ছিল

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

যতটুকু বা আকাশ' তা স্বরণচিহ্ন হ'য়ে যায়, তবু জীবন ফুরোয় না, আর জীবনশ্রেয়ও দুর্ঘরভাবে হানা দেয়, এই কবিসৌগ্য কথাটাই এ-বইটিতে আমরা শুনতে পেলাম। সজ্জয় ভট্টাচার্য এ-বিষয়ে সচেতন যে

- বৈশাখের আষাঢ়ের আশ্বিনের আলো-হারা-পান
মারাবী মমতা আর অজ্ঞানের জ্ঞান
মুহুরে মেলে থাকে শুধু পৌষের ফুলনা :
এ-ফুলনা যেত—

কিন্তু এই 'পৌষের অভিসার', অবস্রয়ের অভিধান, তারই মধ্যে তিনি 'বিস্তৃত রক্তে কপিল কামনা' অম্লভব করেছেন, দেখতে পেয়েছেন 'অপরাজে বিবল রোমের কাণ্ডা'র মতো নারীকে, 'ঝড়ের আকাশে'ও 'মৌমাছির পাখা'র অস্তিত্ব ভোলেননি। চিত্ররূপের ব্যবহারে তার বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিলো, তার উপর এই গ্রন্থে তিনি ছন্দের দিকেও বৈচিত্র্য এনেছেন। কোথাও-কোথাও ছন্দের সঙ্গে গঙ্গা মিশিয়েছেন, নতুন রকমের পরীক্ষা করেছেন 'তিমিরাণি' নামক গঙ্গের মতো ক'রে সাজানো কবিতাটিতে, কিন্তু এ-সবের চেয়েও আমার ভালো লাগলো একেবারে পুরোনো স্বরনের ত্রিপদীতে লেখা একটি ছোটো কবিতা—

আমার আকাশ যেট তবু তারে পেতে দাও
দাও এক কথা
সোনালি সন্ধ্যার আল একবার বলো শুধু
বলো 'ফুলব না।'

এতে যেন অনেক দিনের হারানো একটা স্বাপ্ন কিরে পাওয়া গেলো।

বইয়ের শেষের দিকে ভিন্ন ধরনের যে তিনটি কবিতা আছে, যাতে প্রাচ্য-দেশীয় ইতিহাস-ভূগোলের অনেক গূঢ় তথ্য, এবং হরতো বা কোনো তথ্য, লেখক উদ্ঘাটন করেছেন, তাতে যেন হয় যেন ভালো জিনিশের বড় বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়, অনেক অক্ষুপ্রাস, অনেক মিল এবং অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখের ভারে লেখকের নিজের গলা যেন চাপা প'ড়ে গেছে। এই কবিতা তিনটির অন্তর্বিধ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, 'অপ্রেম ও প্রেম' নতুন ক'রে এ-কথাই প্রমাণ

কল্পলো যে বাংলা লিরিকের কারুশিল্পে ধারা এখন অগ্রণী, সঙ্গম ভট্টাচার্য তাঁদেরই অমৃতময়।

কবিতার যে-দুটি ধারার উল্লেখ ক'রে এই আলোচনা আরম্ভ করেছি, দিনেশ দাস তার কোনোটির মধ্যেই ঠিক পড়েন না, কিংবা তাঁকে বলা বলা যায় উভয়। তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ একটা অস্থির ছটফটে ভাব, যা অদম্যভাবে 'প্রথমা'র প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মনে করিয়ে দেয়, তাঁর কবিতার বিষয় অধিকাংশই বাইরের জগৎ থেকে সংগৃহীত, তাঁর মনের অস্তঃপুর থেকে নয়—আবার পলাতক মুহূর্তের অহুত্বকেও তিনি যে ছন্দের জালে ধরতে পারেন, তারও পরিচয় আছে 'মোমাছি'র মতো গীতিকবিতায়। বাংলা কবিতার আসরে তিনি প্রথম এসেছিলেন আজ থেকে বছর বোলা আগে, 'কান্তে' কবিতার চমক তুলে, যে-কবিতায়, জীবনানন্দের 'কান্তের মতো বীকা চাঁদ'-এর উপমা উন্টিয়ে, তিনি কান্তেটাকেই 'এ-যুগের চাঁদ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই কবিতা বিখ্যাত হয়েছিলো—নিজের স্তম্ভেও বটে, এবং তারই একটি লাইন নিয়ে বিষ্ণু দে আর সুদীক্ষনাথ দত্ত পাঠ্য দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন ব'লেও। সেই সময় থেকে এ-পর্যন্ত (১৯৩৬-৫২) যত কবিতা তিনি লিখেছেন 'দিনেশ দাসের কবিতা' তারই—সংগ্রহ নয়, সংকলন। এই সংকলন কবির ঠিক প্রতিভা দিয়েছে কিনা জানি না ; যুদ্ধের সময়কার ঠাট্টার কবিতা একটিও যেন দেখতে পেলুম না মনে হ'লো। তাছাড়া কবিতাগুলো সাজানোও হয়েছে উন্টোভাবে, অর্থাৎ সাম্প্রতিক রচনায় আরম্ভ হ'লে উজ্জ্বল যাওয়া হয়েছে পিছন দিকে ; এতে, যে-কোনো রকম অভিনবত্ব ছাড়া, আর কী লাভ হ'লো তা ভেবে পাওয়া শক্ত। সাবধানী পাঠক হয়তো পড়বেনও উন্টো দিক থেকে, কিন্তু যে-কোনো দিক থেকেই পড়া হোক, মনের উপর প্রভাব হবে প্রায় একই রকম, কেননা দিনেশ দাসের আগেকার এবং পরেকার লেখায় বেশি কিছু তফাৎ বোঝা যায় না। একদিকে তাঁর ঝোঁক কথ্যভাবার দিকে, চকল তালের দিকে, সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে চোঁচিয়ে উঠে হঠাৎ কিছু ব'লে ফেলার দিকে—অন্য দিকে মাঝে-মাঝে তিনি নিহৃত মুহূর্তের মনের স্রবণও সক্ষম করেন।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

এই আকাশ বহু দীপ।

কোনোখানেই

মুছ নেই

যেখা আকাশ ক্রম দীপ

নিরে শুধু অটীত মৌনমুখ ফুক-মিহিল।

এরই পাশে-পাশে যিনি লিখেছেন

এখানে কাঁটার গুলে কাণে এগে কানায়-কানায়

আকাশ সমর মেঘ একতুটে আঙুলে আঁকা,

একরে অহরে তবু ডাক ঘেঘ বাজবোঁরী পানি

অনন্ত কালের কানে মিহিমিহি সমর আনা—

তার মন যে এক লাইনে-চল। মন নয় সে-কথা আর ব'লে দিতে হয় না। পল্ল-সাংবাদিকতার দিকে কোঁক থাকা সত্ত্বেও, দিনেশ দাসের কবিত্বশক্তি স্পষ্ট, এবং তার পরিচয়ের পক্ষে তাঁর রচনাই যথেষ্ট মনে করি, সম্পাদকের 'ভূমিকা'য় বৃষ্টিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিলো না। বরং ভূমিকাটিতে কিছু অতিশয়োক্তি এবং ভুল কারণে প্রশংসা থাকার ফলে অ-প্রস্তুত পাঠকের মনে উন্টো ফলও হ'তে পারে। উদাহরণত, 'সত্যের দস্তুর যতো এবং জীবনানন্দ দাসের যতো নয়, দিনেশ দাসের কবিতা সববে পড়বার কবিতা'—এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধা হচ্ছি একাদিক কারণে। প্রথমত, জীবনানন্দ দাসের কবিতা সববে পড়বার যোগ্য নয় এ-কথা যিনি বলেন তিনি কখনো মনের কান দিয়ে কবিতা শোনেননি, দ্বিতীয়ত সত্যেন্দ্র দত্তর ছেলেমাছবি তালে কোন বয়স পাঠক আজকের দিনে আর ভুলবে! ছঃধের বিবর এইটুকু যে দিনেশ দাস এই ছেলেমাছবির প্রলোভন সামলাতে পারেননি; 'এ-প্রাস্তরে-তেপাস্তরে,' 'বৈরিতা—বৈরী তা,' 'আফ্রিকারি আফ্রি-কাঁকে'—এই ধরনের মোটা মিল, মোটা অল্লেখ্য এড়িয়ে গেলে তাঁর লেখা আরো ভালো হ'তো, এড়াতে পারলে আরো ভালো হবে।

পুরোপুরি বহিমুখী কবি ব'লে আজকের দিনে যাঁরা পরিচিত, মজলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাঁর 'মেঘবৃষ্টিঝড়', 'দিনেশ দাসের কবিতা'র

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

যতোই, সঃকলনজাতীঃ গ্রন্থ, ১২৪২-৫১, এই ন-বছরে লেখা কবিতার একটি সারসংগ্রহ। ন-বছর বড়ো কম সময় নয়, বিশেষত তরুণ বয়সে, যখন যাক্স খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, বদলায়, এবং নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের ঝগট খেতে-খেতে আপন স্বভাবের পরিণতির সূত্র খুঁজে পায়। যন্ত্রনাচরণের আদি-পর্বের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো, তাই বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তাঁর নতুন বইটি হাতে নিলুম। প'ড়ে মানতে হ'লো তাঁর সংবেদনশীলতা অসামান্য। 'পদাতিক', 'পূর্বলেখ', 'গ্রহণ', 'পসড়া', 'নতুন পাতা', 'স্বামলী', 'পত্রপুট'—বাংলা ভাষার এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থ, এবং স্বদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের নানান ঘটনা—এই দু-দিকের নেঘবৃষ্টিঝড় তাঁর মনে যে-সাদা তুলেছিলো এটা গ্রন্থটি তারই একটি মলিন। এটা সাদা দেবার শক্তিটা মূল্যবান, এবং পৃথকত্বীদের স্পষ্ট প্রভাবের ভিতর দিয়ে তিনি একটি স্বকীয় পথ প্রায় তৈরি ক'রে এনেছেন। 'প্রায়' বললুম এটুকু যে যদিও আবেগবাহী গল্প-কথিতায় তাঁর দক্ষতা লক্ষ্য করলুম, তবু তাঁর এতটা সংহতির অভাবে কতিপয়, অনেক কবিতাতেই ঐগৌর অল্পপাতে বহু খুঁজে পাওয়া যায় না। আর-একটা কথা আমার মনে হ'লো—অন্য উপলক্ষ্য আগেও মনে হয়েছে—যে আউল আমন, ধানের গছ, লক্ষ গ্রামের বাংলা, এ-সব কথা, আবৃত্তি বিদিশা এবং কোনো 'এম'-ভাগ্যলু ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'প্রেম' কথাটার মিলের যতোই, যেন এবার-স্ট্যাম্প পরিণত হ'য়ে গেছে আজকাল, কিছুদিনের জন্য এদের প্রত্যাধরণ এখন অকরিরকম প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। ভৌগোলিক নামের ব্যবহারও প্রায় মুজাদ্দোবে অধঃপতিত—এবং তা শুধু যন্ত্রনাচরণেই নয়—সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যায় সেখানে জনপদের নামের তালিকা বসিয়ে দেয়া হয়েছে শুধু পরিভ্রম বাচ্যবার জন্য, কিংবা বক্তব্যটা লেখকের নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় ব'লে। ঐ সব লক্ষণ যন্ত্রনাচরণে দেখতে না-পেলে আমি বিশেষভাবে সূখী হতাম, কেননা কবিতার যেটি প্রধান গুণ ব'লে আমি মনে করি সেই আবেগের প্রবলতা তাঁর লেখায় বিস্ত্রমান, অন্তত তিনি জোরালো ক'রে বলতে জানেন, এবং সেই কারণে দুর্বোধাতার কাঁড়াও সহজেই কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্বোধাতার বদলে অনর্গলতাও

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

বাহনীর নয়, এবং যুগলাচরণের বিবর্তনের পরের দাপে তাঁর কাছে ঘনতর এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ রচনা আমার প্রত্যাশা থাকলো। আশ্চর্য এই যে যদিও তাঁর উপরে বিষ্ণু দে-র প্রভাব খুব বেশি, তবু তিনি সংহতির সাধনা এখনো করেনি। এমনও যদি হয় সে বিষ্ণু দে নিজেই সেটি সম্ভ্রান্তি ত্যাগ করেছেন, তবু এ-খিনঘে সন্দেহ নেই যে ‘চোরাবাণী’র সংহতিগুণটো তাঁর কাছে অস্তু কবিত্বের শিক্ষণীয়।

‘সমুদ্রকণ্ঠা’ একটি প্রথম কবিতার বই, এবং প্রথম বই হিসেবে উল্লেখযোগ্য। লেখায় বাধুনি আছে, গজকবিতা সুরেলা, এবং ছন্দো-ব্যবহারেও কোথাও-কোথাও নৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটকীয় কবিতা দুটিতে যদিও গজ-পঙ্কজের মিশ্রণের ফলে হেঁচটো পেতে হয়, তবু ‘গ্রহণ’ আর ‘সময়’ নামক কবিতা দুটিতে একটি স্থমিত শ্রী দেখতে পেলুম (শুনতে পেলুম), যার তুলনায় নতুন কবিত্বের লেখার মধ্যে খুব বেশি মনে পড়ছে না।

আগের বিদ্রাং দিগে ভোমাকে ছুঁলাম।
ঘনের অশান্তি দিগে ভোমাকে নিলাম।
সজীবিত সজীবিত হও।

এই ছন্দোবদ্ধ গল্পে কৃতিত্বের পরিচয় আছে, যেমন আছে

এবার বসন্ত
কুলে বসন্ত, সময় হল গানের, সময়
হল, বানের
সময় হল।

এই পঙ্কজ বৈচিত্র্যসাধনে। অবশ্য ‘সমুদ্রকণ্ঠা’ বইটি খুব ছোটো, এবং দু-একটি ভালো কবিতা স্পষ্টে কিছু প্রমাণও করে না, কিন্তু আপাতত সতর্ক না-হ’য়ে আশাবিত হওয়াই ভালো মনে করি—যুগল রাঘবের পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থের অস্তু আমি উৎসুক থাকলাম।

‘সারাহ’ বইটি সম্বন্ধে আমার প্রথম আপত্তি তার নামে। লেখকের প্রথম বই—তুফ না-হ’তেই সারাহ কেন? দ্বিতীয় আপত্তি ছাপায়, অস্তুত একটু ভালো এবং নির্ভুল ছাপার সম্মান নিশ্চয়ই কাব্যকলার প্রাপ্য?

কবিতা

আশ্বিন ১৩৪২

আর কবিতাগুলি—যেমন আজকাল অনেক যুবকই লিখে থাকেন, তেমনি—
আশা নেই, আনন্দ নেই, কলকাতা যুব ধারণা, শাস্তিনিকেতনের ছায়া ডালো,
আরো ডালো স্বর্ণরেখার সূর্যাস্ত—এই স্বল্প আরকি বলবার কথাটা।
শেষোক্ত বস্তু দুটো ডালো নয় তা বলি না, নৈরাস্যের কোনো কারণ নেই
তাও নয়, এবং অরুণ ডট্টাচার্যের কবিতা ডালো নয় এ-কথা বলাও উদ্দেশ্য
নয় আমার। কিন্তু কখনো-কখনো শুধু ‘ডালো’ হওয়াটাই যথেষ্ট হয় না ;—
আমি প্রস্তাব করি এবার স্বল্প-বদল হোক, যুবকরা কিছু যৌবনের তাপের
পরিচয় দিন।

যু. ব.

সম্পাদকীয়

আমাদের তরুণ বয়সে, যখন রবিত্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম, তখন যে-দু-জন কবিত্তে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাঁদের একজন বতীপ্রনাথ সেনগুপ্ত, আর অন্যজন ‘বিশ্বরূপী’র মোহিতলাল। এর আগে অবশ্য ‘স্বপন-পসারী’ ছিলো, কিন্তু, নামেই প্রকাশ, সত্যোত্তর দত্তে আত্ম-ধ’রে-যাওয়া ফুটমান কবিদের পক্ষে ও-বই কোনো কাজে লাগেনি, ‘বিশ্বরূপী’তেই নতুন কবি বেরিয়ে এলেন। আনন্দা, ‘কল্লোলে’র অর্বাচীন দল, সেই কড়া পাকের জমকালো কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিলুম, মোহিতলালকে বরণ করেছিলুম তাত্ত্বিক ব’লে, নির্ভীক দেহসামক ব’লে। ‘দেহে তোমার প্রাণ আছে?’—এই উদাত্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রবলভাবে জবাব দিয়েছিলুম—‘হ্যাঁ!’ রাধা ও ম্যাডোনা’কে একাকার দেখেছিলুম তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে, মূর্তিতাকী যশোদারা আর মদীরাকী বসন্তসেনাকে সমান ভালোবেসেছিলুম। তাঁর এ-সব কবিতার সুরের মিল ছিলো ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলমে’র সঙ্গে—যে-দুটি পত্রিকার নিয়মিত এবং সম্মানিত লেখক ছিলেন তিনি—অথচ তিনি ‘কল্লোলে’র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, এমনকি সেই বীধন-হেঁড়া আন্দোলনের সমর্থকও ছিলেন না। তাঁর দুর্ভাগ্যবশত, তিনি ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, এবং সেই বনেদি মকের উচ্চাসন থেকে যে-রকমভাবে সাহিত্যের ঘাটাই করতে লাগলেন তাতে তাঁর অভ্যাসের সঙ্গে উপদেশের বিস্তর গরমিল ধরা পড়লো। মনে আছে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত একটি প্রবন্ধে তরুণতরদের সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি ইঙ্গিত ক’রে তিনি এই সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক ও অস্বাস্তর মন্তব্য করেছিলেন যে ‘কোনো-কোনো সাপের রংও সবুজ’। আনন্দা, তাঁর ভক্তের দল, তখন এতে অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু ক্রমশ যখন সত্যস্বন্দর দাস প্রাকল্পিত তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী বেরোতে লাগলো তখন অন্য এক মোহিতলালকে দেখতে পেয়ে চমক ভাঙলো আমাদের। আজকের দিনে এ-কথাটা সকলেই জানেন যে মোহিতলালের সমালোচনা মুক্তিবিরোধী, অতীতের আমেজে ভরা, বাংলার উনিশ শতকের ছের টেনে

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

চল্লাই তার লক্ষ্য) — সে-সমালোচনার সমর্থক হ'তে পারেন শুধু তারাই, যারা পশ্চাদপসরণের পক্ষপাতী। তার উপর মোহিতলাল এ-কথা বিশ্বাস করতে সীমাহীনরূপে অক্ষম ছিলেন যে পশ্চাতীরগ্রন্থত কোনো ব্যক্তির হাত দিয়ে বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য কোনো রচনা বেরোতে পারে—এই অচিকিৎস্যা প্রাদেশিকতার ফলেও তার সমালোচনার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তবু এ-কথা সত্য যে তার সাহিত্যপ্রেমে ভেজাল ছিলো না; এবং তিনি যা বিশ্বাস করতেন সেইটেকে খুব ঘোরের সঙ্গে প্রকাশ করার গুণটিও তার ছিলো। আর তার সমালোচনার মূল্য বিষয়ে আমরা যে ঘটাই সন্দেহ প্রকাশ করি না, কাব্যের ক্ষেত্রে তার স্থায়ী অবধারিত : তার জীবৎকালে, অচিন্ত্যকুমার মেন্ডেশ থেকে গোলাম কুদ্দুস পর্যন্ত, অনেক কবির উপরেই তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; তার দৃঢ়গঠিত স্বত্ব-বিস্তৃত কবিতাবলীর উত্তরকালের হাতেও উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা নেই। সংস্কৃত শব্দে শ্রমিকলোনে, সুবকসঙ্কায়, বড়ো তালের দীর্ঘায়িত পংক্তিরচনায়, কাব্যের একটি পরিচ্ছন্ন গম্ভীর রূপ তিনি রেখে গেছেন, এবং 'মৃত্যু ও নটিকেতা'র মতো উৎকৃষ্ট মাইকেলি অমিত্রাকর মাইকেলের পর বাংলা ভাষায় আর-কেউ লেখেননি। তার কাব্যের একটি সংকলনগ্রন্থ এ-সময়ে প্রকাশিত হ'লে ভালো হয়, তাহ'লে বর্তমান যুগের পাঠকদের সঙ্গে পরিচয়ের পথ প্রশস্ত হ'তে পারে।

কবিতা নিয়ে সম্প্রতি যে-অভিনব আন্দোলন চলেছে সেটি আলোচনার অযোগ্য নয়। শনিবারের বিকেলে, আপিস-ছুটির ভিড়ের মধ্যে, কলকাতার কুটপাতে হঠাৎ রোল উঠলো, 'কবিতা পড়ুন! কবিতা পড়ুন! কবিতা না-পড়লে বাঙালি বাচবে না!'—আর অমনি কিছু ভিড় জমে উঠলো চারদিকে, আর একদল নুবক কবিতা আবৃত্তি করে পোনাতে লাগলেন—যদি-বা তাতে হঠাৎ কারো মনের কোনো বন্ধ আনল। ধুলে যায়। এই রকম দুটি পথ-চলতি সভার আনন্ডা পবর পেয়েছি এ-পর্যন্ত, একটি এসম্প্রানেতে, অল্পটি

কবিতা

আশ্বিন ১৩৫২

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, এবং ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও এর পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে শুনেছি। এ নিয়ে কাগজে-কাগজে কিছু ঠাট্টা বেরিয়েছে,—সংবাদপত্রাদির কাছে তা ছাড়া কিছু আশা করাই যায় না; আর যারা কবিতা ভালোবাসেন তাঁরা কেউ-কেউ আপত্তি করেছেন এই ব'লে যে এতে কবিতার মাত্র নামিয়ে দেয়া হ'লো। আমি জানি না কবিতার মাত্র কিসে যায়, ফুটপাতে নেমে এলে, না কি দোতলা-তেতলা স্থল-কলেজে ক্লাশ-পড়ানো পাশ-করানো যন্ত্রের ছিবড়ে হ'বে বেরিয়ে এলে; অস্তুত, দেশের মধ্যে যখন তখন রক্তের উৎসাহ অধিকাংশই ধাবিত হচ্ছে সিনেমা এবং 'লারেলার্স'-প্রমুখ গুঁড়িগানার উপযোগী সংগীতের দিকে, তখন একদল যুবকের এই কাব্যোন্মাদনার খবরে উৎফুল্ল হবো না এত বড়ো আভিজাত্যবিলাসী আমি নই। তাছাড়া এ-রকম আন্দোলন যে কোনো কাজেই লাগবে না তা-ই বা কী ক'রে বলা যায় কবিতা নামক একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে সে-বিষয়ে যদি প্রকৃতিস্থ এবং পদস্থ ভ্রাতৃলোকেরা দৃকিক্ষিত্ব সচেতন হ'লে ওঠেন, তা-ই বা মন্দ লাভ কী। অবশ্য এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হ'লে শেষ পর্যন্ত মাইক্রোফোনে পৌছতে হবে কবিতা। মরে আধুনিক বাস্তবের প্রধান ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মৃত্যুস্তম্ভ; কবিতা কানে শুনেতে হয়, এবং পর্তমান কানে শোনার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে রেডিও আর গ্রামোফোনের রেকর্ড। আমি নিজের রেডিও-যন্ত্রটাকে একবারেই ভালোবাসি না—ওর কলে গান গাওয়া আর গান শোনাও কোনো স্বতঃস্ফূর্তি আর নেই—কিন্তু যে-নীতি অনুসারে রোমে গেলে রোমান বনতে হয়, কি যোগলের হাতে পড়লে খানা না-থিয়ে উপায় থাকে না, সেই নীতি অনুসারেই রেডিওটাকে বর্জন না-ক'রে তাকে ব্যবহার করাই বিধেয়। কলকাতার রেডিওতে সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে ব'লে শুনেছি, সেখানে নাকি পদ্ম-পাঠও হ'য়ে থাকে মাঝে-মাঝে—সেটা কেন আস্ত কবিতার বাহন হবে না এই মর্মে একটা দাবি উত্থাপন করা যেতে পারে। এবং—আমরা যখন সকল বিষয়েই পশ্চিমী দেশের নকল করছি (স্বাধীনতার পর এটা আরো বেড়ে গেছে), এমনকি বাঙালি মহিলারাও শাড়িটাকে মাঘরার কাষদায় কামুফ্লাজ করছেন, তখন ইংলণ্ড-আমেরিকার অনুকরণে বাংলা কবিতারই বা রেকর্ড হবে না কেন?

কবিতা

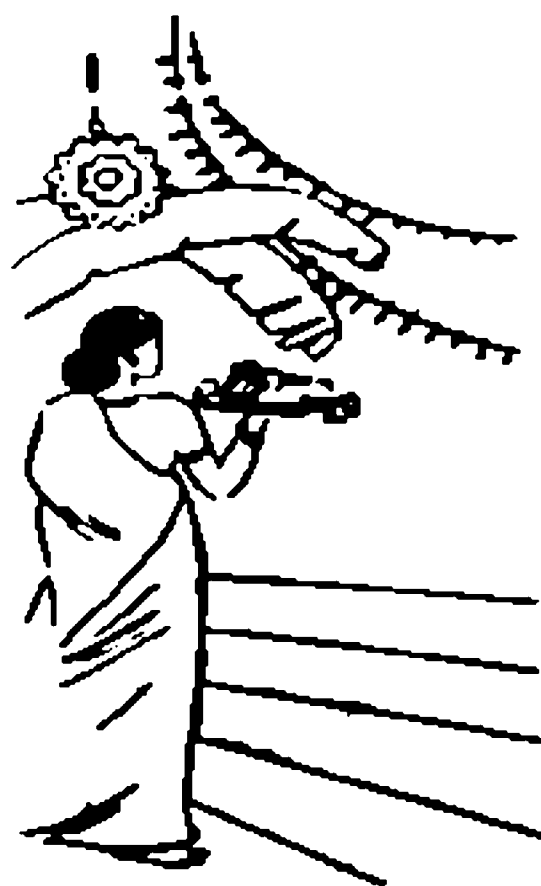
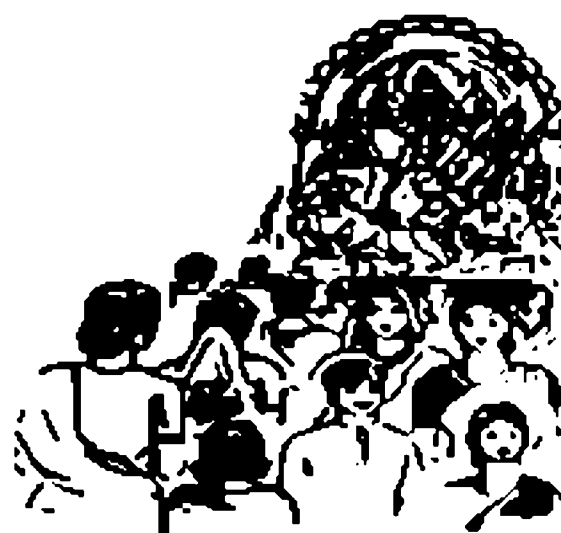
আশ্বিন ১৩৫৯

ইতিমধ্যে কবিতার পত্রিকা, বা সংকলনও নতুন বেরিয়েছে। একটি নয়, দুটি নয়, পঞ্চ-পর একেবারে তিনটি। ‘শতভিষা’, ‘কবিতা পত্র’, তারপর ‘সব শেষের কবিতা’। (এদিকে ‘একক’ কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে আবার বেরিয়েছে ব’লে শোনা গেলো।) নতুন পত্রিকা বা পুস্তিকা তিনটি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু পাতা উন্টিয়ে অনেক নতুন নাম চোখে পড়লো, কাব্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবীদের সংখ্যা মনে হচ্ছে দ্রুত বিবর্ধমান। ভালোই; এঁদের মধ্যে ক-জন বঙ্গসন্ধির ঝাড়া কেটে গেলে আর কবিতা লিখবেন জানি না, কিন্তু আশা করা যায় এঁরা সকলেই কবিতার অনুরাগী থাকবেন—বিষয়টাকে ভালোবাসতে শেখারও একটা উপায় হাতে-কলমে কিছু চর্চা করা। অর্থাৎ, বাংলা কবিতার পাঠকের সংখ্যা যে বাড়ছে তার একটি নিশ্চিত প্রমাণ এতে পাওয়া গেলো। ‘সব শেষের কবিতা’ নামটি খুব কু-নির্বাচিত হয়েছে—কবিতার কি কোনো শেষ আছে? আর ‘কবিতা পত্র’ নামটিতে আপত্তি করি অল্প কারণে, ‘কবিতা’ আর ‘কবিতা পত্র’ তফাৎ খুব স্পষ্ট নয় ব’লে। ঐ নামের পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৩৫৯-এর আশ্বিনে ‘কবিতা’র অষ্টাদশ বছর আরম্ভ হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আরম্ভ হ’লো সপ্তদশ বছর। কিছুদিন ধ’রে অনিয়মিত প্রকাশের পর শেষ বন্ধ করা হ’লো একটা বছর টপকে গিয়ে, পুরোনো গ্রাহকরা এই ক্রটি মার্জনা করবেন। আপাতত এইটেই স্বথের কথা যে আশ্বিনেই আবার বছর শুরু করা গেলো, এবং এর পর থেকে নিয়মিত প্রকাশে আর বাধাও হবে না আশা করছি।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ২৯ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও পূর্বাশা লিমিটেড,
পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩ থেকে
সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

ପୂଜାର
ଅଭିନୟନ



ଐଶ୍ଵର୍ୟ୍ୟ ଦିନେ ଆଜ୍ଞାପଣ

ହାତୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ର

ପ୍ରାୟଶଃ ଯେ ଯେହୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ

ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦିକ ପ୍ରାୟଶଃ

କର୍ତ୍ତାବ୍ୟ ଉପକ୍ରମ ଶାସ୍ତ୍ର

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍

ଭଗବତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍
କର୍ତ୍ତାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର



ଆଗାମି ସମାଜର
ଜନ୍ମ

ଡାକ୍ତର





কবিতা

পৌষ ১৩৫২

সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭২

অনুবাদগুচ্ছ

বিষ্ণু দে

শেক্সপীয়ার : সনেট

১৫

যবে বিবেচনা করি যা কিছু বিকাশ পায় সবই
পরম পূর্ণতা পায় শুধু এক মুহূর্তের তরে ;
এ বিরাট রঙ্গমঞ্চ যা কিছু দেখায় সবই ছবি,
যেখানে নক্ষত্রগ্রহ প্রচ্ছন্ন প্রভাবে ভাস্কর করে :
যবে স্পষ্ট দেখি গাছ-মানুষের বিকাশ সমান
একই আকাশ তলে উৎসাহিত এবং সংবৃত,
যৌবনের রসে দৃগু, উন্নত হলেই ক্ষীয়মাণ,
জাঁকজমকের সাজ ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন বিশ্বত ;
তখন অনিত্য এই অবস্থার ভাবনা চিন্তায়
তোমাকেই দেখি সেরা যৌবনের সমৃদ্ধ আসনে,
যেখানে আকস্মিকে কাল আর ক্ষয় ব্যস্ত মস্তণায়
তোমার যৌবন-দিবা দৃষ্ট-রাত্রি বিষাবে কেমনে ;
কালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে তাই, প্রেমের বিক্রমে,
সে যতো তোমাকে হানে, আমি ততো জীয়াই কলমে ॥

তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে ?
 তুমি আরো রমণীয়, শীত উষ্ণে আরো যে সুধম ।
 চৈতালির রূঢ় বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে,
 বৈশাখের চুক্তিপত্রে দিনের মৌরুসী বড়ো কম,
 থেকে থেকে আকাশের চোখ জলে প্রবল বিক্রমে,
 এবং সুন্দর সবই সৌন্দর্য খোয়ায় কালক্রমে
 দৈবে কিংবা প্রকৃতির রূপান্তরে রূপসজ্জাহীন ;
 আবার কখনো দেখি স্বর্ণবর্ণ মেঘাভ মলিন ।
 অথচ তোমার নিত্য বসন্তের নেই ক্ষয়রোগ,
 তোমার রূপের স্বহ হাতছাড়া হয় না ভুলোকে,
 মৃত্যুর ছায়ায় ঘোরো মৃত্যুর এ দস্তুর সুযোগ
 হবে না সেদিনও, যবে কালোস্তর হবে নিত্যশ্রোক,
 যতোদিন মানুষের প্রাণ আছে, আছে দু'নয়ান
 ততোদিন আরু এর, এ তোমাকে করে প্রাণদান ॥

আমার দেহের জড়সত্তা যদি চিন্তা হত, তবে
 মর্মঘাতী দূরত্বেও থামত না আমার প্রয়াণ,
 কারণ তখন আমি যেতাম এ স্থানবদ্ধ তবে
 বহুদূর পার হ'য়ে যেখানে তোমার অবস্থান ।
 কিছুই না আসে যায় চলি আমি কোথায় পা ফেলে
 তোমার বিরহে স্থল পৃথিবীর দূরতম কোণে,
 কারণ দ্রবিত চিন্তা জলস্থল লঙ্ঘ্যে অবহেলে,
 যেখানে সে ঠাই চায় চ'লে যায় ভাবামাত্র মনে ।

তবু আহা ; চিন্তা হানে : আমি কেন চিন্তা নই, ধিক্,
তবে তো যেতাম শতকোশ পারে তুমি যেইখানে,
কিন্তু ক্ষতিঅপু ছই উপাদানে আমার অধিক,
কালের মর্জিই ভরসা ব'সে থাকি রৌকুচ-নয়ানে,
কিছুই আয়ত্তে আসে নাকো এই মন্দের সম্ভার,
গুরুভার অশ্রু ছাড়া, চিহ্নমাত্র দৌহার ব্যথার ।

৫৫

মর্মর মিনার কিংবা রাজ্যন্যের সুবর্ণ-তোরণ
বাঁচে না এ পরাক্রান্ত কবিতার মতন অক্ষয়,
জেনো তুমি দোষি পাবে এরই মাঝে অম্লান কিরণ
কালের কাদায় লেপা ধূলিকীর্ণ পাথরে তো নয় ;
যখন ধ্বংসাত্মী যুদ্ধে মৃতি সব হবে ধূলিসাৎ,
যখন লড়ায়ে সব স্থাপত্যের কীর্তি হবে মীন,
তখনও চণ্ডীর খড়্গ, যুদ্ধের প্রচণ্ড অগ্নিপাত
ব্যর্থ হবে, স্মৃতিলিপি তোমার রইবে ক্ষয়হীন ।
তোমার জয়াভিযানে সর্বলোপী বৈরী-যে বরণ
সেও পিছু হ'টে যাবে, তোমার প্রশস্তি নিরবধি
ভ'রে দেবে অনাগত যুগান্তরে সবার নয়ন,
উত্তরাধিকার যারা ব'য়ে চলে প্রলয় অবধি,
সুতরাং যতোদিন কালান্তরে না হও উন্মিত
তুমি বাঁচো এতে, যতো প্রেমিকের নয়নে জীবিত ॥

৭৩

আমার মাঝারে হের সংবৎসরের সেই কাল,
যখন পল্লব গীত ছায়কটি ঝোলে কি না ঝোলে,

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

হিমবাত্তে কম্পমান শাখে শাখে বিবিস্ত করাল,
কীর্তন-আঙিনা শূন্য, মধুমুখী পাখী গেছে চ'লে ।
আমার মাঝারে দেখ সজ্জারাগ গোখুলিলগনে,
সূর্যাস্তের পরে যবে দিন চলে পশ্চিমসাগরে,
আর ধীরে ধীরে কৃষ্ণরাত্রি তাকে টানে আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর দ্বিতীয় সস্তা, ঘুমে তাকে সবাকৈ আদরে ।
আমার মাঝারে দেখ সেই বহি দীপ্তশিখা যার
আপন যৌবনভস্মে জ্বলে যায় তবু লেলিহান,
যেন বা আপন চিতা জ্বলে যেথা মৃত্যু অনিবার,
জীয়ায় যা তাকে, সেই পৃষ্টিতেই তার অগ্নিবাণ ।
এতো তুমি বোঝো, তাই ভালোবাসা প্রবল তোমার
অচিরে হারাবে যাকে দাও তাকে প্রেমের সংকার ॥

১৩০

আমার প্রিয়ার চোখ নয় বটে সূর্যের সমান,
প্রবাল অনেক লাল সে-বিশ্বাধরের তুলনায়,
তুমারে শুভ্রতা যদি খোঁজো তবে বন্ধ তার স্নান,
কেশ যদি তন্ত্রী হয়, কালো তার বাঁধা সে-মাথায় ।
দেখেছি গোলাপ নানা বর্ণময়, লাল ও পাতুর,
গোলাপ দেখিনি কিন্তু আমি তার গালে চুমা খেয়ে,
এবং আতরে নানা গন্ধ বটে অনেক মধুর
আমার প্রিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসের চেয়ে ।
ভালোবাসি কথা তার তবু আমি এই সত্য জানি
সংগীতের স্বর নয় হোক না মধুর তার গলা ।

অবশ্য দেখিনি আমি দেবী কোনো কিংবা দেবযানী,
তবু জানি প্রিয়া যদি চলেন তা শুলমর্থে চলা ।
অথচ আশ্চর্য জানি আমার প্রেয়সী সুনিশ্চয়
ব্যর্থ যতো তুমনার মতোই, সে তুল্য যার নয় ॥

শ্লোক : আয়োরেস্তি

৭৫

একদিন লিখেছিলাম তার নাম সমুদ্রসৈকতে,
কিন্তু উর্মিদল এল, নাম ধুয়ে দিল জলোচ্ছ্বাসে ;
আবার লিখিলাম নাম অন্য হাতে তিন্ন রীতিমতে,
শিকারী ছোয়ার এল আমার অমকে নিল গ্রাসে ।
বলিল সে, হে দান্তিক কেন যাতে এ-ব্যর্থ প্রয়াসে,
এই অবিনশ্বরতা নশ্বরের মাঝে অন্বেষণ,
কারণ স্বতই আমি বাঁধা সেই ক্ষয়নাগপাশে
এবং আমার নামও যুছে যাবে অচিরে তেমন ।
নাহে তা, (কহিলাম আমি) নীচ সব বস্তুর মরণ
হোক ধূলিমৃত্তিকায়, তুমি হবে যশেই অমর,
তোমার ছল'ভ গুণ কাব্যে আমি করি চিরস্তন,
তোমার নামটি লিখি উর্ধ্বলোকে গৌরবে ভাস্বর,
যে লোকে, যখন মৃত্যু সারা বিশ্ব করিবে শাসন
আমাদের প্রেম হবে ভাবী জীবনের উজ্জীবন ॥

১ চারটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

পাখিবা

মেপল-ওকের সারি উচু মাথা গাছ,
দূর পখিকের চোখে আলোর আড়াল
নীলের লঙ্ঘন ঐ শৈলসারি
ফেলে চলে যাব কাল ।

চেয়েছি কি বেশি, বলো,
তুধু যদি ছদও চেয়ে থাকি
এই বহু আকাশ-ধারণ
অরণ্যের শান্তি অকারণ
তোমার প্রশান্ত দৃষ্টি মেশা
একটু হাসির দৃষ্টি-নেশা ?
রক্তে যদি ফিরে ডাকে নিঃস্বনিত গাছের শরীর
আমার শরীর বোধে, নির্ঝরিত সঙ্ক্যাগ্নি আবির
শ্যামতা মিশ্রিত মত্তে, মুহূর্ত তন্ময় সেই কালে
তুমিও তো এসেছিলে সৃষ্টির সকালে ।
তাই সর্বাস্তির পরিচয়ে
খুঁজেছি স্বর্গতা বুকে, হে পাখিবা, তোমারো প্রত্যয়ে
শেষ লগ্নের বিনিময়ে ।
ভোরে দরজায় আমি যেই
ধুলোয় রেখেছ দেখি তুমি-হার। শূন্য ভরা নেই—
এই কি তোমার দান একাকীর পথে
মৌন অদেখা ক্ষণে বিদায়-বিহীন শেষ ব্রতে ?

সব মুছে দেওয়া বিশেষ খুঁজে দিলে দিক—

মহা পাওয়া কোথা আছে তারি আরো করেছ পথিক ॥

২৮ বুলাই
ভেরনট

ক্রিয়াম ক্রিয়ণী

হুজুনায়ে যেতে ঐ নীল সিঁদু-পাখী ওড়া তীরে
ভালো করত যদি দেখত হুজুনায়ে বালির অশ্রুতায়
আলগা পৃথিবী, নিত একান্ত প্রেমের দগ ঘিরে
মধ্যাহ্ন মাস্তুলে কাঁপা চিকণ রোদ্দুরে আড় চোখে
বৃহৎ আত্মীয় বিশ্ব প্রতাহ সস্তার কিনারায়
ক্রকলিন থেকে মাঝি যেখানে নৌকো বেয়ে যায়,
ব্যস্ত সংসারের নূরে নূরে জ্বল-ফেলা, শূণ্য চিরে
ঠক্ ঠক্ শব্দ ওঠে হাতুড়ির, লাল ধোঁয়া ঢোকে,
প্রচণ্ড খাটুনি ঐ মিস্ত্রিদের।—কেননা, একদিন
স্বচ্ছ ব্যবধানে বেলা অস্ত হয়ে এলাবে যখন
অত্যন্ত দুঃসহ লাগবে হুজুনায়ে বেশির সঙ্কণ
মহতীর ছায়া, যদিও উজ্জলতর। সর্বলীন
সেই ঘনিষ্ঠতা ওরা হাতে-হাতে ধরে যাতায়াতে
মুগ্ধ বুকে জানবে যত, কাছে পাবে মৃত্যুশয়ন
আপন প্রাণের ছবি, সিগারেট-মুখে বেঞ্চে বসে
না-দাড়ি-কামানো বুড়ো প্রসন্ন রুক্ষ দৃষ্টিপাতে
দেখে সমুদ্রের জল, হঠাৎ জেটির ভিড়ে পশে
মজ্জায় গভীর তারি পরিচয় : ওরা বোঝে, তাই

এই বেলা, সুধায় নিবিড় বেলা, অস্তরঙ্গ ভলে
ওদের তন্ময় যেন হোঁয় আরো ; চলেছি সবাই
মস্ত জাহাজের ভেঁ। কাছে দূরে ডাকে যাত্রীদলে ॥

লিঙ্গিক

জানতামই না যখন তুজন, সে তো অনেক দূর ;

তারো চেয়ে দূর যে আজ তুপুর।

এক মুহূর্তে ছিন্ন সুতো সমস্ত এষ্ট বেলা

অলৌক আলোয় খেলে খেলা ;

কলোরাডোর সূক্ষ্ম পাহাড় সোনায়ে মেলা

ঘরভারা রোদ্দুর।

ল্যাভেণ্ডারের গুচ্ছ ভরা বাগান কোণে

লিঙেনের এই বীথি,

ছায়া-রাস্তা পায়ের শব্দ মিথ্যে গোনে ;

অদৃশ্যে বিস্মৃতি

শোনে আপন সুর।

মধ্যে শুধু নীল অনন্ত দিক-দিগন্ত নয়

নয়তো কেবল ছলছল উতল সমুদ্র—

দিনে দিনে ঝিলিক গাঁথা জেনার সময়

প্রাণের খেয়ায় উধাও উদাস বাতাসে বয়।

পৃথিবীতে লয় ছিল এই মিলনের ঘর,

এসেওছিলেম তুজনে——তারপর ?

১৬০৪ স্মৃতিগিটি ডাইন্ত

পরে পরে নয়, এক সঙ্গে । ঝিরিঝিরি
চুলে ছোঁয় বহু হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,
কফির সুরভি, টোটে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে সাতটার গোলাপী আলোর ঠাণ্ডা নেশা—
যুহুর্তের এই মূর্তিবহ
শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ওড়ি-কলোনের গন্ধমাখা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলান্তে পাঠাই দূর পাখা ।
ঝগ্ ঝগ্ ট্রেন শব্দ, স্টেশনের স্তব্ধ রোদ,
কাল রাতে স্বপ্নে দেখা ডোবা বোধ,
পৌছন তবুও ফিরে-চাওয়া ;
ক্লান্ত পড়ানোর ঘণ্টা এ বাজে, বাস্তব হাওয়া ।
লরেন্সে আমার বাড়ি, সোনার গমের কিনারায়
বিদায় সিঁড়িতে তার এ লগ্ন দাঁড়ায়—
(ঠিকানা এখনো সেই ঘোমো-শূন্য-চার)
কলোনের স্মৃতি-গাঁথা নাও উপহার ॥

চিত্রলেখা

অশোকবিজয় রাহা

৫

ভালের সারির পিছে দূর-মাঠে দিগন্তরেখায়
চকচকে সূর্যের ঢাকায়
উঠে এল ঝকঝকে দিন
কাশফুল-মেঘটুকু ছিঁড়েখুঁড়ে হলো চিরুহীন ।

মাঠের এপারে
কৃষ্ণচূড়া-বীথির কিনারে
সবুজ মাথায় ঢাকা
রঙিন ধনুক-পথ আঁকা ।

চারদিক ফাঁকা,
শুধু এক সাঁওতাল মেয়ে
গাছের আড়াল থেকে দূর-মাঠে চেয়ে,—
হাসে দু'টি গাল
কানের পলাশফুলে লাল
খোঁপায় কুটেছে এক জবা
অপরূপ শোভা ।

৬

কোথায় অদৃশ্য ট্রেন ঝড় তুলে ছোট্টে উদ্‌বাস
হু-হু করে নেমে এল চাঁদ-জলা মাঠের আকাশ
দিল দেখা
একভিড় তালগাছ, দূর-গ্রাম, মৌন বনরেখা ।

কবিতা

পৌষ ১৩৫২

এখনো গতির বেগ পাখা কাপটায়
তালের পাতায়
এখনো গতির রেশ কঁপে-কঁপে যায়
শরবনে হাওয়ার রেখায়
এখনো আধেক ছবি ফুটেছে কায়ায়
আধখানা জড়ানো ছায়ায়
তবু এই চাঁদ-জলা মাঠ
অসীম কালের টানে ছুটে এসে বেঁধেছে জমাট ।

৭

শেষরাত
কৃষ্ণপক্ষ-চাঁদ
বাড়ায়েছে শীর্ণ হাত
পেয়ারার ডালে,
ঘুমন্ত খড়ের চালে
ডানা নেড়ে
বাহুড়ের কালো ছায়া উড়ে যায় পাখিসাট মেরে,
এক ধারে
পড়েছে গভীর ছায়া ইদারার পারে ।

হঠাৎ চমক ভাঙে পেঁচার চীৎকারে ।
রাত কত ?
ভয়ান্ত বোবার মতো
তাকায় পেপের গাছ খতমত ।

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

৮

জ্যোৎস্নার মাঠে
রাত কাটে ।
দূর দিয়ে একসারি তালগাছ হাঁটে
তাকালেই থমকে দাড়ায়
চোখ টিপে চায় ।
একটি পাণ্ডুর মুখ কে যেন বাড়ায়
রুম্ব চুল উড়ে পড়ে গায়
ক্লান্ত সুরে বারেক শুধায়
‘কবে এলে ?’
শরবন একপাশে হেলে ।

চোখ পড়ে পূবে
ছায়া গেছে উবে,
ধূ-ধূ সাদা
জ্যোৎস্নার ধাঁধা
দিগন্ত ভরাট
মরুমঠ—
ধবধবে ধাঁ-ধাঁ
শূন্য কাকা
নিশ্চল বালির ঢেউনাচ ।
তুমি এক উটপাখি গাছ
মাঝখানে একপায়ে খাড়া
সঙ্গ ছাড়া ।

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

৯

শোনো

জ্যোৎস্নারাতে কোনো

নিজের ছায়ার সাথে শূণ্যমাঠে ঘুরেছ কখনো ?

হঠাৎ হয়েছে মনে তুমি এক ছায়ার শরীর

শিরায়-শিরায় কাঁপে শরের পাতার শিরশির

চেতনায় মিশে গেছে ঝিঁঝিঁ-ডাকা ঘাস

ঘাসের নিঃশ্বাস

নিঃশব্দ ডানায় ভেসে হয়ে গেছে দূরের আকাশ ?

তা'হলে দেখেছ তুমি দূরে সেই ধবল বিশাল

নিরবধি কাল,

আলোর স্কোনাঁকিগুলি ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়ে তার গায়ে

কত তারা গিয়েছে হারিয়ে ।

র‍্যাবো-র তিনটি কবিতা।

অনুবাদ : লোকনাথ ঔট্টাচার্য

স্বরবর্ণ

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই বস্তু, উ হরিৎ, ও নীল :
স্বরবর্ণ, বলি আমি তোমাদের গুঢ় পরিচয়
আ, তমসাক্ত নীলীবাস, ক্রুর পুতিগন্ধময়
রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্বীকৃত করে, খিল
মহা গুহার : অ, বাষ্প অথবা শিবির ঝঞ্ঝুরেখ,
বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রানা, কম্প্র পুষ্পদল
ই, লোহিত, বস্তু ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল
অথবা মদের শেষে স্নান মধু অধরে ক্ষণেক :
উ, আকাশবস্তু, স্পন্দমান দিব্য হরিৎ সাগর
শাস্তি তাপিত জীবের, যে-শাস্তি নিখিল হুঃখহর
আকে স্নিগ্ধতার রসে চিস্তাশীল কুঞ্চিত কপোলে ;
ও, পরম ভেরী বাজে তীক্ষ্ণধার অপূর্ব স্বরিত,
লোক-লোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচকিত
—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে ।

শাস্তী

আবার ফিরে পেয়েছি তারে ।
কারে ?—শাস্তীতে ।
সমুদ্র সে সূর্যে মেশে
মিলন-মন্দিরে ।

কবিতা

পৌষ ১৩৪২

মৃত্যুঞ্জয়ী আমারো মন
তোমারি স্বতে চলে,—
যদিও রাত প্রবঞ্চিত,
আগুনে দিন ছলে ।

চতুর তুমি, তোমাতে তাই
যত্নে পরিস্কৃত
প্রাকৃত সুখ-দুঃখাবেগ—
তুমি অকুণ্ঠিত ।

—আশার পথে কখনো নয়,
উদয়-পথে নয় ।
সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিড়ম্বনাময় ।

আয়ত্তি চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয়,
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয় ।

আবার কিরে পেয়েছি তারে ।
—কারে ?—শান্তীতীরে ।
সূর্য আর সমুদ্রের
মিলন-মন্দিরে ।

মাতাল তরলী

নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরল-চঞ্চলে
কখন খেয়াল হ'ল গুণ-টানা মাঝিদের টান
ধেমে গেছে : হতভাগ্য, প'ড়ে মস্ত বর্বর-দঙ্গলে
রক্তাক্ত খুঁটির গায় বিদ্ধ তারা—নথ, লস্করমান ।

ধারি নাকো কোনো ধার মাঝি-মাল্লাদের, অথবা কে
ক্লাণ্ডার্সের শস্যবাহী, বণিক বিলাতী কার্পাসের—
মাঝিদের চাঁচামেচি ক্ষান্ত হ'লে পর নদী ডাকে
আপন খুসির পথে অন্তহীন অবগাহনের ।

ছুটেছি—গুনেছি যেই মদমত্ত ছোয়ার-জঙ্গিমা,
আমি গত শীত ঋতু, বধির করেছে কেউ তারে
শিশুরও মস্তিষ্ক হ'তে ! উপদ্বীপে বিড়ম্বিত সীমা
টলমল করে যার ঘন অন্ধ আবেগ-সঞ্চারে ।

ঝঙ্কা হ'ল আশীর্বাদ সাগর-যাত্রার চেতনায়—
অল্লালোকে মূঢ় চোখ ; দশ রাত্রি তবু সারাক্ষণ
সমানে নেচেছি চ'লে তৃণ হ'য়ে তরঙ্গ-মালায়—
যে-তরঙ্গ, লোকে বলে, মৃতের নিয়ন্তা সনাতন ।

অম্ল আপেলের মাংস শিশুর যত না প্রিয়—তার
চেয়েও সুন্দর এই হরিতান্ত জলের উত্তালে
দীর্ঘ দেবদারুজাত তরী ; নীল মদের ঞ্চকার
আমায় বিধৌত ক'রে বেসামাল তোলে দাঁড়-হালে ।

তখন হ'তেই শূন্য সাগরিকা কবিতায় স্থান,
নিখিল আকাশগ্রামী ছায়াপথ, তারার মুহূর্ত
যেখানে বিবর্ণ এক তন্ত্রালস মুগ্ধ ভাসমান
তিমির গভীর স্বপ্নে ক্রমাগত ডোবে অশ্রুমনা।

সেখানেই অতর্কিতে সমুজ্জ্বল দিনের পীড়নে
নীলিমা রঞ্জিত হয় ধীর ছন্দ-শুষ্কতার রসে—
কৌ উগ্র মদিরা তার, কৌ বিপুল বীণার রগনে
প্রেমেরে গাঁজিয়ে তোলে খর তিস্ত রক্তিম উরসে।

চিনি সেই সন্ধ্যা, ঘনঘূর্ণি, জলস্তম্ভ—আতি তার
বুক-ফাটা আকাশের লেলিহান বিছাৎ-শিখায়
এক ঝাঁক পারাবতে ভোর জাগে যখন আবার
হয়তো দেখেছি তারে লোকের যার বসে দেখা যায় !

দেখেছি শায়িত সূর্য কলঙ্কিত অপূর্ব ভীষণে,
জমাট বেগুনি তার উদ্ভাসিত মহিম অন্ধরে—
টেউ যেন নট এক বিস্মৃত কালের প্রকরণে,
খড়খড়ি ঝিলমিল খোলে বোজের দূর দূরান্তরে !

স্বপ্ন দেখি, ঝলসিত তুঘারের নীলিম রজনী
চূষনেচ্ছু হ'য়ে ধীরে ছোঁয় যেন সাগর-নয়ন—
অশ্রুত প্রাণের রসে নৃত্য করে শিরা উন্মাদিনী,
• সাগর, জোনাকি-অলা, জাগে এক পীত জাগরণ।

সারা মাস আমি যেন আস্ত এক পাগল গোয়াল
পবন-বজুর বেগে ছুটে চলি শৈল-অতিক্রমে—

ভাবিনি মেরীর দুই আলোকিত চরণের তাল
বিস্কুল সাগরও রাখে লাগামের পাখান সংযমে ।

দেখেছি, ঠেকেছি কত—জানে না তো কেউ, অপকৃপ
জনপরী, মানুষের মতো গাত্র, স্বাপদ-নয়না—
আঘাতে সে বারবার কী জানায়, সে-বাণী নিষ্ঠূপ ;
দিগন্ত-বীণার তারে উল্লসিত অবর্ণবরনা ।

অপ্রমেয় কত জলা দেখেছি ফেনাতে ; জাল, যার
রক্তে রক্তে কত তিমি অবহেলে প'চে গ'লে যায়—
নিঃশ্রোতা কোথাও তুলে অকস্মাৎ মল্লিত স্বংকার
আবর্তে প্রপাত হেনে ধ্যানমগ্ন দিগন্ত কাঁপায় ।

আকাশ দাবাগ্নি-জ্বলা, গেসিয়ার, হিরণ্য ভাস্কর,
শুক্লকপী ধারা, লুপ্ত ভগ্নপোত অতল পিঙ্গলে
অগণ্য মৎকুল যার ছিঁড়ে যায় ভীম অজগর—
উচ্ছিন্ন বৃক্ষের কাণ্ডে অককার সুরভি সকলে !

কেন যে শিশুরা নেই তাই ভাবি যখন লহরী
এমন সুনীল আর স্বর্ণ-শফরীর লাস্য আঁকা ।
—নিরুদ্দেশ এই যাত্রা ধন্য করে ফেনিল মঞ্জরী,
কী এক পবনে আমি বারবার হয়েছি বলাকা ।

প্রাস্তবদে কটিবন্ধে আবদ্ধ শহীদ—নিরুপায়
নাচে কুল সমুদ্রের বিরহ-নিঃশ্বাসে অম্লক্ষণ
আধারে পুষ্পের ছাতি পীত হ'য়ে নয়নে ঘনায়,
আর আমি ব'সে থাকি নতজানু নারীর মতন ।...

তরী হ'ল দ্বীপ যেন—তীরে তার খঞ্জন-নয়না
পাখির পুরীষ আর কিচির মিচির কলস্বরে—
যতই ছুটেছি চ'লে, প্রথবন্ধে হারায় চেতনা,
পিছনে ডুবতে চেয়ে ঢেউগুলি ঘুমে ঢুলে পড়ে।...

বন্ধের করাল চুলে সমুচ্ছল হারালো তরঙ্গী—
ঝটিকা-ভাঙিত আমি ঈশ্বরের হীন বিহঙ্গমে :
স্থির জ্ঞানি কোনো পোত নেই কোনো বিশল্যকরণী
জলোন্মত্ত দেহটাকে রক্ষা করে ছরস্তু হুর্গমে...

ধূম্র এক কুয়াশায় চ'ড়ে ব'সে স্বচ্ছন্দ গতিতে
সুকবির অনবদ্য চাঁটনি সেই আরক্ত আকাশ
প্রাকারের মতো দীর্ণ করি, যার সর্বগাত্রটিতে
নীলার অনন্ত ক্রন্দ, সবিতার শৈবাল-নির্ধাস।

শিরায় শিরায় রক্তে বহিমান বিদ্যাহ-চেতনা,
ক্ষিপ্ত পাটাতন, বসীকৃষ্ণ সিঙ্ক্বেঘাটকের দল
ইঙ্গিতে দেখায় পথ—বর্ষা যেন মূর্ত উন্মাদনা,
আকাশ সাগরাতিগ অগ্নিমুখী আভায় বিহ্বল।...

যোজন যোজন শুধু দৈত্য আর আবর্ত করাল :
ক্রুর সেই নিদারুণ চেতনায় কাঁপি ধরধর—
এরাই নিশ্চল নীলে শাস্ত্রীর রচে ইন্দ্রজাল ;
কোথায় যুরোপ-কূল সুপ্রাচীন প্রাকার-মুখর !

দেখেছি দ্বীপের পুঞ্জ নক্ষত্র-খচিত সারে সার,
উদাস আকাশে যার যাত্রী শোনে চির-আমন্ত্রণ

—অতলাস্ত এই রাতে ঘুমাও, না হয়েছে ফেরার,
হে ভবিষ্য বীর্যবান, লক্ষ-লক্ষ স্বর্ণ হীরামন ?—

তবু বৃথা কঁাদা । জানি মর্যাস্তিক উষার লালিমা,
চন্দ্রমা অসহ চিরকাল, তিক্ত রবি-রশ্মি-কণা
কটুস্বাদ প্রেমে শুধু স্ফীত হবে মাতাল জড়িমা—
হায় দীর্ঘ তরী, হায় নিরুদ্দেশ সমুদ্র-মন্তণা !

যদি চাই যুরোপের সলিল, হোক তা সরোবরে
স্নেহের শীতল জল—যার কোলে সুরভি সন্ধ্যায়
দুঃখভারে পদু এক শিশু শেষ পরিহার করে
ভঙ্গুর তরণী তার বসন্তের পতঙ্গের প্রায় ।

তোমার ক্লাস্তির স্থানে আর আমি নেই ঢেউ, নেই,
জল আমি কাটব না কার্পাসবাহীর চোখে ; মিছে
উদ্ধত নিশানে তার জৌলুস-শিখায় পাল্লা দেই,
কী কাজ সঁাতারে গাধাবোটাদের কটাক্ষের নিচে !

টীনে কবিতা

অনুবাদ : দিলীপ বসু

৭

লেখা থামিয়ে চেয়ে রইলুম পশ্চিমের জানলা দিয়ে
পাইন আর বাঁশবনে অসীম নিস্তকতা ।
টান উঠল, ঘরে এল ঝিরঝিরে হাওয়া ;
হঠাৎ মনে হল যেন পাহাড়ে সন্ধ্যা নেমেছে ।
তাই ঝিমোতে-ঝিমোতে স্বপ্ন দেখলুম
চলে গেছি দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তরে
শুয়ে আছি সিয়েন-উ মন্দিরে ।
ঘুম ভাঙতে কানে এল দূর প্রাসাদের ঘড়ির
টুংটাং শব্দ
তখনো মনে হল ওটা যেন পাহাড়ে ঝরনার
ঝরঝর ধ্বনি ।

(পো-চু-ই : নবম শতক)

৮

সুসময় আসবে না আর ।
এক মুহূর্ত পরে
আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা হবে শেষ ।
বাকের মাথায় এসে পৌছই,
কী কোরবো ভেবে পাই না ।
দুধারে ধানের খেত
আমার হাত তোমার হাতে, কথা নেই মুখে ।

ছোটো-ছোটো শাদা মেঘ ভেসে যায় আকাশে ;
আবার কোথাও গিয়ে জোট বাঁধে ;
এলোমেলো বাতাস স্বর্গে গিয়ে মেশে ।
এখন থেকে অনেকদিন আমাদের আর দেখাই হবে না,
অতএব এসু আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি

চুপ করে ।

ইচ্ছে হয় প্রভাতের পাখায় ভর দিয়ে
তোমার সঙ্গে উড়ে যাই

তোমার যাত্রার একেবারে শেষপ্রান্তে ।

(লি লিঃ কৃঃ-পূঃ প্রবন্ধ শতক)

৯

চোখ গেছে, বই খুলতে সাহস হয় না
বৃষ্টিতে ভিজে গেছে রাস্তা, কাদা জমেছে ;
বন্ধুরা কেউ যে আসবে
তারও উপায় নেই ।
সারা দিন কী ক'রে কাটাব,
এই বারান্দায় একশোবার

পাইচারি করেই কি কাটবে সারাটা দিন ?

(ওয়াইয়াং ওয়ান-লি : ১১২৫-১২০৬ খৃঃ)

১০

যদিও সমুদ্র বছর বছর হল, তবু বই ছাড়া থাকতে চাই না :
মনে হয় একমাত্র মৃত্যু এসেই কেড়ে নিতে পারবে সেগুলো ।

কবিতা
পৌষ ১৬৪৯

উঠে পড়ি, জ্ঞানলার বাতিটা উল্কে দিয়ে
কাটিয়ে দি এই ঝড়বাদলের রাত ।

(ল গুপ্তাই ষ্ট ১১২৫-১২০৭ খঃ)

১১

বসন্ত প্রভাতে ঘুমিয়ে ছিলুম
ভোরের কথা খেয়ালই করিনি,
চারদিক থেকে খুশিভরা পাখীদের
কিচিরমিচির শব্দ কানে আসছিল ।
মনে পড়ল রাস্তিরে ঝড় হয়েছিল ।
না জানি কত সুন্দর ফুল ঝরে পড়েছে ।

(লি গো ১০১-১৬২ খঃ)

ছটি কবিতা

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস : সেপ্টেম্বর '৫০

হঠাৎ হেমন্ত আসে। আর্স্-এর বুক-ভাঙা কনকনে মেঘ
দিগন্ত-বিলাসী চোখে গাঢ় পুরু বোরখা পরায়।
ভিজ়ে মাঠে স্যাংসেঁতে অপকৃষ্ট কবিতার মতো,
সপ্‌সপে ঝরাপাতা বিষাদের কার্পেট ছড়ায়।

নির্বোধ নৌলিমা ধোওয়া আকাশের প্রবীণ কপালে
মননের কুটি কুটিল।

সমাহিত শাঁজেলিজে, আরণ্যক বোয়া-ঝ-বুলোন্।
ছলছল, কাদা-ডোবা, ধমধমে ঘন বন চিরে
সম্মান পথ ঠাটে মন।

অমিতাভ গিরগিটি ধ্যান করে কুরিনামা ওক্-এর তলায়।

কালের কপণ-মুঠি খসা এক প্রবাল-প্রহর।

কঠিন নির্মাক-ভাঙা অন্তরঙ্গ পরিচয়ে উচ্চকিত হবে কি বনানী,
অনাথীয় হে হৃদয় মোর ?

তক্ষুনি ঝরঝরে রোদ ওঠে। ঝলমলে বন।

তির্যক কামনার গাণিতিক কশাঘাতে কাৎরায় মন।

কার্ত্তিয়ে লার্ত্তা

বুলভার সাঁ মিশেল্ নিঃসাড়ে ঘুমোয়।

ভার্কিক ছাত্তের ভিড় ভেঙে গেছে রাত্রির হাওয়ায়

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

হালকা মেঘের মতো । পাঁথের নিধর ।
একে-একে লুক্সাবুর্গে পরিভ্রাস্ত পাতা ঝ'রে যায় ।

ঐশ্বের উচ্ছ্বাস শেষ । এলো ক্রান্ত হেমন্তের রাত—
আবেগের ছাই মাখা মননের শাংকর ঐহর ।
হিম পড়ে । পাতা ঝরে । ঝ'রে যায় অনেক শপথ ।
গাঢ় ঘুমে পাশ ফেরে স্বপ্নালু শহর ।

তারার আকৃতি নেই—প্রলোভন কবোষ কাতর,
গ্যাডিওলাসের ছন্দ অন্ধকার বন-বীথিকায় ।
কোনো মুখ বুকে এসে দেবে না তো অলৌক আশ্বাস
তোমায় অমর ক'রে যাবো সপ্তশত গীতিকায় ।

অবিভ্রাস্ত পাতা ঝরে—অবলুপ্ত কবির লেখন,
টাদের আগুনে যারা সঁকেছিল মন আর ক্ষয়িত শোণিত
প্রাচীন কাহিনীতে কোনো, হয়তো বা এঁকে যেতে কোনো
মুখ কথার রেখায়—
শেখায় তাদের প্রেত হাতে ধ'রে কালের গণিত ।

ঘুমে ভারী “বুল্ মিশ্” । নিরাশ্রয় মন
অর্থহীন পৃথিবীতে খুঁজে মরে যে-কোনো সংকেত ।

হিমার্ত হৃদয় চায় পথপ্রান্তে পাতার উত্তাপ ।

সোর্বনে গ্রহর গোনো রিশ্লো-র প্রেত ॥

ভাষ্য :—“কার্ত্তিঘে লাভ্যা”—প্যারিসে ছাত্র-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের নিরঙ্কশ স্বরাজ্য ।

“লুক্সমাবুর্গ” —বিখ্যাত পার্ক—বহু কবি-শিল্পীর প্রিয় ।

“বুল মিশ্” —বুলভার সাঁ মিশেল-এর আত্মরে ভাকনাম ।

“রিশ্লো” —কার্ত্তিনাল রিশ্লো, বর্তমান সোর্বন্-এর প্রতিষ্ঠাতা ;
সোর্বনেই সমাধিস্থ ।

মাম খোদাই

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই-যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী

আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,

এখানে গত একুশে আশ্বিন

শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন

বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথিলাম

ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম ।

এবারে এসে হঠাৎ দেখি নেই সে-নাম নেই,

শুকনো নদী ঢাকলো মুখ আমার সামনেই

রুগ্ন মাঠে ঘাসের হাটে নামের দাম নেই ।

সহসা শুনি অনেক দূরে অনেক মাঁওতালি

মদের পর মাদলে মাতে খালি ।

পা টিপে-টিপে সেখানে গিয়ে যখনি দাঁড়ালাম,

এগিয়ে এসে শুধালো ‘তোমার নাম ?’

তাদের বুকে এ-নাম বুনে বলেছি : ‘ভুলবিনে—’

আমাকে আমি ভুলেছি এই একুশে আশ্বিনে !

মিঃসজ

সদ্বিৎ শর্ম্মা

তখন মাঠের বুকে জ্যোৎস্নার ঝড়,
নদীর হাওয়ায় গান, বনের মর্ম্মর,
নক্ষত্র মিছিল, নীল আকাশ ; শহর
ঝিমায় একটু দূরে, ঝিমায় ওপার !

তখন একান্তে ব'সে বন-জ্যোৎস্নায়,
গভীর মনন নিয়ে চোখের ছায়ায়—
ক্রান্ত যুগ চাপা সুরে বলে সে আমায়--
'কী হবে এখানে বেঁচে, কী হবে আমার !'
(ঝিমায় শহর দূরে, ঝিমায় ওপার ।)

মানে নেই, জীবনের কোনো মানে নেই ;
কী হবে বা খেতে সোনা-ফসল নিয়েই,
কী হবে বা পৃথিবীর কিছুটা জেনেই !
বেঁচে থাকা—এই এক ব্যাধি মনে হয় ।

কোথাও তো প্রেম নেই ; ধূ-ধূ অবিশ্বাস !
বাতাসে সৌরভ নেই ; ভূণে দীর্ঘশ্বাস !
টানদের ধবল লেগে পৃথিবী আকাশ
ব্যাধিগ্রস্ত ; স্তব্ধ রাত ; মৃত্যু সূনিশ্চয় ।
বেঁচে-থাকা, এই এক ব্যাধি মনে হয় ।

কবিতা।

পৌষ ১৩৫৯

বাহুড়ের চংক্রমণ গাছের মাথায়,
কোথাও কুকুর ডাকে, প্যাঁচা উড়ে যায়
কটু চিৎকারে ; সে-ও মুখ তুলে চায়—
তারপর কী বিষণ্ণ পা বাড়ায় ধীরে ।

তখন মাঠের বুকে জ্যোৎস্নার ঝড়,
নদীর হাওয়ায় গান, ফুলের নিশ্বর,
নক্ষত্রের ভিড় নীল আকাশে, শহর
ঘুমায় সে কোন গানে কতো স্বপ্ন-নৌড়ে
ঘুমায় ওপারে চর সুষমার তীরে ।

ছটি কবিতা

স্বাভাবিক দেবী

প্রত্যাহ্বান

মধ্যদিনে ফিরে আসি । সঙ্গে এই বসন্তকৃত্ত হৃদয়,
—ক্রুর উত্তরাধিকার । ফিরে নাও—তুমি দয়াময় ।
আকাশবিহারী আশা—স্বপ্ন কতো ঘুমের পশ্চাতে—
তুমি তার কী বুঝেছো ? মন যে ঘিরেছে অনাস্থাতে ।
হে ঈশ্বর, কথা দাও । কারো চোখে জ্বালাও আলোক,
আত্মা যাতে ধন্য হবে । মর্মদাহী তোমার পাবক,
তুমি এর মর্ম জানো । তুমি আনো ভাবগ্রাহী ছোতা ।
হে ঈশ্বর, কী দিয়েছো ! আত্মা কাদে—বোঝে না জনতা ।

ঘুমোতে পারি না কেন ? রাত জাগি, সূর্য অলস চোখে ।
চারদিক অন্ধকার, পুড়ে মরি নিশ্বের আলোকে ।
মধ্যদিনে ফিরে আসি, ব্যর্থ জীবনের ঋণ শুধে
হয়তো মিলিয়ে যাবে অস্তুহীন প্রাণের বৃদ্ধদে ।

বুঝবে না, কী যে ক্ষতি !—আকাশে এখনো সূর্য হাসে,
এখনো ফুলের হাস্য প্রসন্ন বিকেল নিয়ে আসে,
এখনো পৃথিবী ছিলো, শস্য ছিলো । তবু, উপবাসী
হৃদয়ের বোঝা ব'য়ে মধ্যদিনে আমি ফিরে আসি ॥

বাড়ি

পূর্বপুরুষের বাড়ি কথা বলে । প্রত্যেক কোণায়
উত্তম তর্জনী তোলে রক্তের সংস্কার । জ্যোৎস্নায়

জড়িয়ে-জড়িয়ে বাঁধে মনপ্রাণ প্রাচীন মায়ায় ।
কিসকিস শাসনের তাল ভোলে আকর ছায়ায় ।
আলো নিবে গেলে আমি একা । এই বাড়ি মুখোমুখি ;
পূর্বপুরুষেরা আসে—সুখে সুখী তারা, দুখে দুখী ।
দীর্ঘদিন কেটে গেছে, সেই সব স্মৃতিকথা বলে
এ-বাড়ির কোণে-কোণে । সন্ধ্যায় সমস্ত আলো জলে
একবার । তখন স্বপ্নেরা আসে, ঘরে-ঘরে মূর্তি হ'য়ে বসে ।
বাড়ি তো নির্জন নেই—আছে, ঠিক যেমন ছিল সে ।
আহা, তবু সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে যে যায় একাকী,
সেই বোধে, কী শূন্যতা, কী বেদনা । সব স্বপ্ন, কাকি ।

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

অমুরাধার জন্তে

সঙ্গর ভট্টাচার্য

তোমার ত চোখ খালি তুণ
বাণ শুধু জল
কাজলে করবে তারে কতো উচ্ছল—
কি ভাবে নিভাবে বলো জলের আগুন ?

আলোয়া যে জলে আর নেভে
তোমার তিমির তারে কতোটুকু দেবে
কতো কটু আছে তমোগুণ—
অধরে কি অধরের পাবে পরিমল ?
রাত্রিকে অরণ্য ভেবে
জোনাকিরা হবে নাকি কখনো অনল ?

যৌবন যবনিকা থাক ।
চকাচকি শুধু চোখাচোখি নির্বাক ।
কার সাধ চাঁদ পেয়ে পাতাল অতল ?
থাক রাস বসন্ত-বাস ।
আর কেন রাঙা ফাঁকি অশোক-পলান
বধু-সীমা কেন বারোমাস
দোল-ঝুলনের পালা, ফুলমালা, ফল ?
ফিরে-ফিরে কেন অজান-ফাকুন ?

দিনের পর দিন

বুদ্ধদেব বসু

বৃষ্টির দিন

বৃষ্টি এলো, আবার বৃষ্টি ! বৈশাখের রূপসী বৃষ্টি নয়, আবণের আদরে ভরা স্পর্শ নেই, হিম বৃষ্টি, কালো বৃষ্টি, হেমন্তের শীত-নামানো বৃষ্টি ।

আ, এই ভালো, এই আমার ভালো লাগে ! আশ্বিনের উজ্জল দিনগুলি তাদের হিরের দাঁত দেখিয়ে ব'লে গেছে আমাকে, 'ওরে প্রক্ষিপ্ত মানবক, বিশ্বের অপলাপ, চেয়ে ছাথ আমাদের দিকে—কী সুন্দর আমরা, কী নির্মন, নির্মম, উদাসীন !' তাদের আলোর ধারে ছিঁড়ে গেছি আমি, তাদের বাজের ভারে অবসন্ন ।

সাস্থনা নিয়ে এলো এই দিন, এই মুয়ে-পড়া, বুজে-আসা, নিরবয়ব দিন । হটা মুছে গেছে, সময়ের ক্রুর কামড় আঁধার সইতে হবে না আমাকে—কিছুক্ষণ, অস্তুত কিছুক্ষণ ছুটি ! সকাল মিশে যাবে দুপুরে, দুপুর মিলিয়ে যাবে বিকেলে—চিহ্ন নেই, গয়না নেই, অঙ্গ নেই—একটানা, একাকার, ধূসর ।

আজ আকাশ ভ'রে মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আমারই আশ্রয় কালিমার মতো, আর এই রুঢ় বৃষ্টির তলায় কলকাতা প'ড়ে আছে যেন কামুক স্বামীর তারপিষ্ট কোনো নির্বোধ নিঃসাড় ক্লাস্ত সহিষ্ণু প্রৌঢ় রমণী ।

আমি ব'সে আছি জানলায় ; অন্ধকার মেঘের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনন্তকালের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি আমার মনস্তাপ—তিক্ত স্মৃতি, হ্রস্ব অনুশোচনা, আমার নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ চীৎকার ।

এদিকে মানুষের সংসারে বেলা বাড়ে ; কেউ দোকান খুলে বসে, কেউ ফের বাজার থেকে, আর একে-একে ট্রামের স্টপে

লোকেরা এসে দাঁড়ায়—ছাতা নিয়ে, বর্ষাতি নিয়ে, বেঁচে থাকার
গম্ভীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভুলে থাকার উদার আশ্বাসে মজ্জমান।

কী ভুলতে চায়? বেঁচে আছে, তা-ই ভুলতে চায়।

কুনছো না বৃষ্টির শব্দে আকাশ ভ'রে ঘোষণা উঠছে—‘পালাও!
আপিনে, ফ্যাঙ্কিরিতে, ফটকাবাজারে, রাজনীতির উত্তেজনা—
যেখানে হয়, পালাও! আর যখন সঙ্কর পর আর-কিছুই থাকবে না,
তখন মদ, তখন জুয়ো, তখন গণিকার পরিশ্রমী আলিঙ্গন।
যেখানে হোক, যে ক’রে হোক—পালাও, হুঁতুগা জীব, লুকিয়ে
রাখো তোমার চেতনার অভিসম্পাত, ভুবিয়ে দাও দিনের পর
দিনের এই আবর্তন—এই হত্যাকারী আবর্তন! কেননা মৃত্যু
ছাংখের নয়, ভূমি যে মরছে সেটা জানতে পাওয়াই যন্ত্রণা।’

রাত্রি

রাত্রি, প্রেমসী আমার, প্রেম হও, নিদ্রা দিয়ে না।

তোমার মনে আছে, রাত্রি, আমাদের মিলনের অন্তষ্ঠান?
সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ, আরো
অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জলন্ত, আগুনের নিশ্বাস-ফেলা
অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা,
আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উদ্গাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ,
আমার আশ্বাস নির্যাস, সম্ভার সৌরভ।

দিন, তোমার বোন, তোমার সতিন, সে তার কাঁকন-পরা মোটা
হাতে বাধ্য করেছে আমাকে, নিয়ে গেছে টেনে তার অগ্নিতে-গলিতে,

আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বাজিয়ে-বাজিয়ে। ব্যস্ত সে, অটল
রোজ নিয়েও অস্পষ্ট; এলোমেলো, ছেঁড়াখোঁড়া, আকৃতিহীন;
তার যুহূর্তগুলি শিষের মতো বোবা শব্দে ফুটপাতে খ'সে পড়ে,
তার ঘণ্টার টুকরোগুলোকে ছোঁড়া দিয়ে আর-কিছুই পাওয়া
যায় না—শুধু খিদে পাওয়ার দীনতা, খেতে পাওয়ার হীনতা, শুধু
ইতর সুখ, বামন দুঃখ।

এই দিন আমি মেনে নিয়েছি, সহ্য করেছি, বকলশ-আঁটা
কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে—তোমার জ্ঞা, তোমারই জ্ঞা,
রাত্রি! আ, সেই যুহূর্ত, যখন, দিনের যুঠো শিথিল, রাবণ ভিড়
নিবৃত্ত, আমি আবার খুঁজে পেয়েছি তোমাকে, নগ্ন হ'য়ে, শুদ্ধ
হ'য়ে, তোমার কালো চুলের অতল নীল তরঙ্গ-তরঙ্গ স্নান ক'রে
বলতে পেরেছি—‘আমি আছি।’

তুমি আমাকে দিয়েছো তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ—ম'রে-যাওয়া,
ফিরে-আসা চাঁদ, আর নক্ষত্রের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার! আর আমি
তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণ, আমার মন, আমার চেতন সত্তা
নিংড়ে-নিংড়ে পূর্ণ করেছি চুম্বনের পাত্র।

মনে আছে?

আমি খেলা করেছি তোমার চাঁদ নিয়ে, যেমন শুয়ে-শুয়ে
কানের ছলের মুক্তো গোলেনে প্রেমিক, তোমার বাঁকা চাঁদ, রোগা,
ঝোলা, চ্যাপ্টা চাঁদ, শাদা, সবুজ, হলদে, উর্বশীর রূপের মতো
নির্লব্ধ, ভাঙা কাচের দাঁতের মতো শীতের চাঁদ, ঈশ্বরের ক্ষমার
মতো দিগন্তে। দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার, উঠেছি তার
ধাপে-ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময় ঢালু দিয়ে গড়িয়ে,
তার নরম, রোমশ, অক্ষুন্ন ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছি,
তোমার বিশাল, তরল আলিঙ্গনে মীন হ'তে-হ'তে বুকেছি যে

নক্ষত্রেরা আর-কিছু নয়, তামসীর চিহ্নর রূপ—যখনই তুমি চিন্তা
করো, তখনই আকাশে তারা ফোটে, মনস্থিরা ।

আর আমিও চেয়েছি আমার চিন্তা আলো হ'য়ে ফুটুক,
তারা হ'য়ে অলুক, শাদা, সবুজ, সোনালি তারা, বরফের চোখের
নতো ধারালো, দেবতার অঙ্কুর মতো দিগন্তে । আর যখন, তোমার
সেই পূর্ণতার গ্রহণে, যখন কবি, হুঃখী, চোর ছাড়া আর-কেউ
জ্বগে থাকে না, আমার আশার অন্তবেগ আমাকেই মাড়িয়ে গেছে
খুরের তলায়, তখন তোমার ফুলে-ফুলে-ওঠা বুকের মধ্যে থরথর ক'রে
কঁপেছি আমি, বলেছি তোমার কানে-কানে আমার আকুল হুঃখ,
পাগল বাসনা, বাসনার ব্যর্থতা—তোমারই কানে-কানে, প্রিয়তমা !

তুমি আমাকে মাখনা দাওনি—হীন মাখনা দাওনি ; শুধু
তোমার গুণনময় স্তব্ধতার সুরে বলেছো, 'এই নাও, এই বিশাল
দেশ, বিশাল নির্জন, এক জনতাকীর্ণ ক'রে তোমো তোমার রক্ত
দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে !'

আমার বাসনা, আমার পরাজয়, আমার হুঃখের ঐশ্বর্য, তার
বদলে এই তুমি দিয়েছো আমাকে—এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ,
আর অনিবার উদ্গাদনা ।

সব ভুলে গেছো ?

না, না, আমি জানি তোমাকে, ছলনাময়ী, তুমি অসতী হ'য়ে
জাগিয়ে দিলে আমার পৌরুষ, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আলিয়ে
দিলে তৃষ্ণা । একদিন তুমি নিজেই ধরা দিয়েছিলে আমাকে, আজ
তোমার এই পণ যে আমি তোমাকে জয় করবো, রাক্ষসী মৃত্যুকে
মেরে জয় ক'রে নেবো তোমাকে, অজরা । আর যেহেতু আমার
কথা ছাড়া অস্ত্র নেই, গান ছাড়া সৈন্য নেই, তাই কথার
ইম্পাতে শান দিয়ে-দিয়ে এই গান আজ বানালাম—ফিরে এসো,

কবিতা

গৌর ১৩৫২

রাজি, নেমে এসো এই মৃত্যুর উপর, আনো তোমার বুক ভ'রে
আমার যন্ত্রণা—স্বপ্ন দাও, দুঃস্বপ্ন দাও, দাও ঈশ্বরের মতো কবির
নিঃসঙ্গতা, কিংবা জ্বরের প্রলাপের আনন্দ—তোমার চিরযৌবনের
যে-কোনো একটি চিহ্ন দাও আমাকে—তুখু নিজা দিয়ে না, নিজা
দিয়ে না। আমাকে বাঁচতে দাও তোমার মধ্যে, তোমার নীল,
কুটিল শিরায়-শিরায় আমি যেন ছড়িয়ে যাই আকাশ ভ'রে, তোমার
চাঁদের ভাঙা-গড়ার স্পর্শ নিয়ে রঙিন হ'য়ে উঠি, স্পন্দিত হই
নক্ষত্রের নিশ্বাসে ;—আর যখন, আমাদের প্রণয়ের তাপ মইতে
না-পেরে হিংস্রক দিন দিগন্তকে ডিমের মতো ফাটিয়ে দেয়, তখন
তোমার বুজে-আসা চোখের—তোমারই রহস্যের অপরিমাণ উজ্জ্বল
ভারে বুজে-আসা চোখের—সর্বশেষ পলকপাতে আমি যেন
চিরন্তনকে পান করতে পারি—এক মুহূর্তে, নিঃশেষে।

অন্তঃসার

অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবন যেন একটা বহতা নদী আর আমরা শিল্পীরা যেন তাতে ডুব দিয়ে যে যার গাগরী ভরিয়ে ঘরে ফিরি। যে যার গাগরী উপুড় করে বলি, আমার কিছু দেবার ছিল, যা একান্ত আমারই। কথাটা মিথ্যা নয়, কেননা ডুব তো আমি সত্যই দিয়েছি, গাগরী আমি সত্যই ভরিয়েছি। অথচ যাতে ডুব দিয়েছি, বার জন দিয়ে গাগরী ভরিয়েছি তা আমার নয়, তা নিখিল বিশ্বের নিত্য প্রবাহিত জীবনযমুনা। যে রস আমি দিয়ে যাচ্ছি সেও কি আমার! হায়! আমার বসতে ঐ গাগরীটি। ঐ মানবহৃদয়টি।

শিল্পীর হৃদয় ভরে রয়েছে জীবনের কাছে পাওয়া কটুতিক্ত অল্পমধুর নানা অব্যক্ত অভিজ্ঞতায়। তার সেখনৌ বা তুলি বা সেতার দিয়ে সে ব্যক্ত করতে চাইছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যক্ত করতে পারলেই হালকা হয় তার হৃদয়। তার পর তার হৃদয়ের রস কয় অপরের, হয় সকলের। ব্যক্ত করতে করতে ছড়িয়ে দিতে দিতে যা একের অন্তর হতে অন্তের অন্তরে উপনীত হয় আর্টের অন্তঃসার সেই জীবনযমুনার জল, সেই হৃদয়গাগরীর রস। যার নাম জীবনের সত্য সেই হয় হৃদয়ের সত্য। সেই সত্যই ব্যক্ত হতে হতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলি আর্টের সত্য। জীবন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে তার যাত্রা। এই যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর্ট অস্তিত্ব পেয়েছে।

জীবনের সত্য কি আর্টের সত্য? হ্যাঁ এবং না। ‘হ্যাঁ’ এইকথো যে গোড়ায় ওটা একই বস্তু। ‘না’ এইকথো যে মাঝখানে আছে

মানবহৃদয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে না গেলে জীবনের সত্য আটের সত্য হয় না। হতে পারে বিজ্ঞানের সত্য, দর্শনের সত্য। কিন্তু আটের সত্য হৃদয়নিরপেক্ষ নয়। ঐ যে গাগরীটি ওটি না থাকলে নাগরী হয় না। জীবনযমুনার জল আনতে হয় নাগরীকে, গাগরী ভরিয়ে। শিল্পীকে হৃদয় ভরিয়ে। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না।

হৃদয় যেন মধুচক্র। সেখানে সঞ্চিত হয় নানা ফুলের মধু। কিন্তু তোমার সঞ্চিত মধুর আশ্বাদ যদি আর কেউ না পায় তা হলে তোমার মধুসঞ্চয় কোনো দিন আটের পর্যায়ে উঠবে না। হৃদয় না থাকলে শিল্পী হয় না। কিন্তু হৃদয় থাকলেও শিল্পী হয় না, যদি না তার সঙ্গে থাকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ও কৌশল। যাতে শিল্পীর সঞ্চয় রসিকের উপভোগ্য হয়। রসের সঙ্গে রূপ যোগ করতে পারলে তবেই রসিকজন উপভোগ করেন, রূপভোগ করেন।

রস যখন রূপাঙ্কিত হয়, রূপাস্তরিত হয় তখন তা আশ্বাদনযোগ্য হয়। তখন তা হয় কাব্য বা সংগীত, চিত্র বা অভিনয়। রস বলতে বুঝি হৃদয়রস, কিন্তু তার পূর্বে সেটা জীবনযমুনার জল। হৃদয়রস যদি হয় মানবহৃদয়ের অভিজ্ঞতা তবে জীবনযমুনার জল হবে রিয়ালিটি, মানবহৃদয়কে যে ভরে দিচ্ছে অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার পূর্বে সেটা রিয়ালিটির খণ্ড। শিল্পের মূলে আছে রিয়ালিটি, মাঝখানে রিয়ালিটির অভিজ্ঞতা, উপরের দিকে অভিজ্ঞতার রূপায়ণ বা রূপাস্তর। ফুল সকলে দেখতে পায়, কিন্তু মূল দেখতে যায় ক'জন! আর কাণ্ড—তাই বা ক'জন দেখতে চায়। শিল্প শেখানোর ক্ষেত্রে যে-সব ফুল কলেক্ট হয়েছে সেখানে রিয়ালিটির খোঁজখবর কেউ রাখে না, মানবহৃদয়ের নাড়ীনক্স জানে না, কলাবিদ্যাই সেখানকার একমাত্র পাঠ। সেখান থেকে উত্তরে

আমা রীতিনিপুণদের কাছে বিশ্বরহস্য বা হৃদয়রহস্য একটা কথার কথা। একমাত্র সত্য হচ্ছে রূপ।

কিন্তু কিসের রূপ? রূপের পশ্চাতে কী আছে? অভ্যস্তরে কী আছে? এর উত্তরে কেউ বলবে, কিছুই নেই, না থাকলেও চলে। কেউ বলবে, আছে একটা না একটা বিষয়, কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয়ের গোচর, তার সঙ্গে হৃদয়ের কী সম্পর্ক তা জানিনে। চোখ দিয়ে দেখেছি, হৃদয় দিয়ে দেখিনি, কান দিয়ে শুনেছি, শ্রাব দিয়ে শুনিনি, হাত দিয়ে ছুঁয়েছি, চেতনা দিয়ে ছুঁইনি। দরকার আছে বলে মনে হয়নি।

রূপভোগ যে কেন রসভোগ নয় তার কারণ নিহিত রয়েছে এই সব উত্তরে। আর্ট বলে সাধারণত যার পরিচয় তার রূপ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্য অনেক গভীর স্তরের ব্যাপার। মানবহৃদয়ের গাগরী কাঁখে নিয়ে জীবনযমুনার সলিলে অবতরণ করলে, অবগাহন করলে, নিমগ্ন হলে তবেই তুমি তার সন্ধান পাবে। আগে সন্ধান পেলে পরে সন্ধান দেবে। তখন তোমার রূপসৃষ্টি হবে সৌন্দর্যসৃষ্টি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য, কবি কীটসের এই আশু বাক্য তখন অর্থবান হবে।

আর্টের অস্তঃসার তা হলে জীবনের সত্য, জীবনের সৌন্দর্য। তোমার অস্তরের অস্তঃসারও তাই। তোমার অস্তরের অস্তঃসার হয়েছে তা আর্টের অস্তঃসার। আর্টের প্রতিষ্ঠা সত্যের নৈলের উপরে। অতি কঠোর ভিত্তি। অতি সুদৃঢ় ভিত্তি। তবে মানব-হৃদয়ের নরম মাটি ও কচি ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা। সত্যিকারের আর্ট কখনো অসত্য হতে পারে না। তবে মানুষের সুখ দুঃখ তাকে রসাল করে। তার পর সেই রসাল সত্যকে রূপাস্তরিত করে কলাবিতের কলাবিদ্যা, মায়াবীর মায়াদণ্ড। সত্যের সঙ্গে মায়া

মাথানো হয়। তখন তাকে মায়া বলে ভ্রম জন্মায়। তবু আসলে সে সত্যই। সত্যই আটের অসুঃসার। আট দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের জোরে। এবং সত্যের জোর হচ্ছে সৌন্দর্যের শক্তি। সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য। এখানে যে সৌন্দর্যের কথা হচ্ছে তা শিল্পীর সৃষ্ট নয়, তা শিল্পীর দৃষ্ট।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সত্যকে বা সৌন্দর্যকে আমরা শিল্পীরা যেমনটি দেখি তেমনটি দেখাইনে। কারণ আমরা তো কেবল ভ্রষ্টা নই, আমরা স্রষ্টা। স্রষ্টা মাত্রেই অধিকার আছে সৃষ্টিকে তার মনোমতো করবার। মনোমতো না হলে ভেঙে চুরমার করবার। বিশ্বস্রষ্টা প্রতি নিয়ত এই কর্ম করছেন। আমরাও করে থাকি। একটি গল্প বা একখানি উপন্যাস শেষ পর্যন্ত যে আকার নেয় তা জানাদের নিজেদেরই স্বপ্নাতীত। জানার সঙ্গে অজানাকে মিলিয়ে, ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে জুড়ে, কত বাদসাদ দিয়ে, কত অদল বদল করে অবশেষে যা গড়ে তুলি তা জীবনের মতো নয়, তা মনের মতো। হয়তো মনের মতোও নয়, নিজের মতো। গল্প তার নিজের নিয়মে চলে, লেখকের শাসন মানেন না, এমনও তো দেখেছি। সেই অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে চড়লে সে যে কোন তেপাস্তুরের মাঠে নিয়ে যায়, কোন খালে বিলে কন্দরে, তা সেই জানে। স্রষ্টার অধিকার খাটাতে গিয়ে দেখি সৃষ্টির স্বকীয় একটা অধিকার আছে, বেশী রাশ টানতে পারিনে। বিশ্বস্রষ্টার দশাটাও বোধ করি আমাদেরই মতো।

মোটের উপর যা হয়ে ওঠে তার সমস্ত খলন পতন সত্ত্বও স্থিতি সত্যের উপর। সত্যের অভিস্রুতার উপর। সেইজন্যে সে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। শুধু তাই নয়, সে বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গ। তাকে ছেড়ে বিশ্বসৃষ্টি নয়। আমরা যখন সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি

করি তখন বিধাতার সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি করি। বিধাতার সৃষ্টি যদি নিরর্থক না হয় আমাদের সৃষ্টিও নিরর্থক নয়। এর সার্থকতা এর অন্তর্গত সত্যে। সত্যের সাক্ষাৎকার যদি না পেরে থাকি তবে অসন্তুষ্ট অসুখ কথা। তা হলে ব্যর্থতা ঢাকবার উপায় নেই। কানা চোখ চশমায় ঢাকলে কী হবে! হালোই বা সোনার চশমা। সৃষ্টি সেখানে অনাসৃষ্টি। কারণ অস্তুঃসারশূন্য। আর্টের চরম বিচার তার অন্তঃসার দিয়ে। রূপ বা রীতি দিয়ে নয়। আর্ট যেন এক প্রকার সাক্ষ্য। সাক্ষ্য যদি সত্য না হয় তবে বিচারক তাকে নাকচ করেন।

কিন্তু আমাদের সত্য আদামতের সত্য নয়। জীবনের তথ্য হৃদয়ের সত্য। এর ব্যাখ্যার ধারাও এক রকম নয়। এর প্রতি অঙ্গে মায়া মাখানো। সেইজন্মে এক মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। শিল্পীকে সামাজিক কাঠগড়ায় দাড় করালে তার যুগ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তা নিরোট বাস্তব নয়, মায়াময় রসাল সত্য। সংসারী লোকের শুনে ধাঁধা লাগে। তারা বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ে আর বলে, রবি ঠাকুর হৈয়ালি লিখেছেন।

সত্যের বিচার ওভাবে হয় না। হয় সহজ বোধ দিয়ে। ঘণ্টা যেমন বাজে সত্যও তেমনি। কথাটা কি সত্যের মতো বাজছে? যদি সত্যের মতো বাজে তাহলে ওটা সত্যই। গল্পটা কি সত্যের মতো বাজছে? না, বাজছে না। তাহলে ওটা সত্য নয়। অনেক জাগতিক ঘটনা সত্যের মতো বাজে না, যদিও লোকের চোখে দেখা। আবার কাল্পনিক ঘটনাও সত্যের মতো বাজে। যদিও কেউ চোখে দেখেনি। মানুষের চোখের আড়ালেও কত কী ঘটছে, ভিতরে ভিতরে মন দেওয়া নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, একজন আরেক-জনকে টানছে, কিস্বা ঠেলছে, দূরে সরে যাচ্ছে বা সরিয়ে দিচ্ছে,

এসবের সত্যতা কি চোখে দেখা ঘটনার চেয়ে কম? লোকে হয়তো বোঝে না, সরল করে বোঝানোও যায় না, পাঠকের ও লেখকের উভয়ের অক্ষমতার দরুণ সত্যের প্রতি সংশয় জাগে।

সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে। যে পড়বে সেও। উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না। এর জগ্গে ডুব দিতে হয় জীবনযমুনায়া। সেটা একটা কাটা খাল নয় যে তোমার ইচ্ছা খাটবে তার উপর। কোথায় যে তার আদি তা কেউ বলতে পারে না, কোথায় যে তার অন্ত তাও কেউ জানে না। কবিত্ব করে যমুনা বলেছি বটে, কিন্তু জীবনের দিকে তাকাতে ভয় করে। ডুব দিতে গিয়ে কত লোক তলিয়ে গেছে অতলে। জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দুঃখ দৈন্ত দম্ব। পদে পদে স্নেহ প্রীতি বরুণাও আছে। নইলে চলা কবে থেমে যেত। মানুষের চলার কথা বলছি। জীবনের চলা কি থামতে পারে! জীবন নিত্য চলমান। মানুষ না থাকলেও সে চলত, না থাকলেও চলবে। মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবলে দুঃখ দৈন্ত স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির অর্থ হয় না। মানুষিক ভাবনার উদ্দেশ্য উঠলে এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যায়। কিন্তু এ কাজ শিল্পীর নয়, দার্শনিকের। তবে যে শিল্পী সে দার্শনিকও হতে পারে, তার শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে তার বিশ্ব দৃষ্টি একাকার হতে পারে। বড় বড় কবির বেলা এ রকম ঘটেছে। দাশু, গোটে, রবীন্দ্রনাথের বেলা।

রূপালি স্নান

শামসুর রাহমান

ওধু হুঁটুকরে। ওকনো কুটির নিরিবিলি ভোজ
অথবা প্রথর ধু ধু পিপাসার অাজলভরানো পানীয়ের খোজ
শাস্ত সোনালি আঙ্গনাময় অপরাহ্নের কাছে এসে রোজ
চাইনি তো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পাথে চাইনি ওধু
ওকনো কুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল। এখনো যে শুই
ভীক-খরগোশ-ব্যবহৃত ঘাসে, বিকসবেলার কাঠবিড়ালিকে
দেখি ছায়া নিয়ে শরীরে ছড়ায়, সন্ধ্যানদীর আকাবাক। ডানে
মেঠো টাঁদ লিখে

রেখে যায় কোনো গভীর পাচারি—দেখি চোখ ভ'রে
ঝিঁঝিঁর কোরাসে স্তব্ধ, বিগত রাত মনে ক'রে
উন্মন-মনে হরিণের মতো দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস,

হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি অঙ্গম মোমাছদের
পাখা-গুঞ্জে জ্বলে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি, প্রগাঢ় মদের
চঞ্চলা সেই রসে-টুপটুপ নর্তকী তার নাচের নূপুর

বাক্যায় হৃদয়ে মদির শব্দে, ভ'রে ওঠে সুরে শূণ্য হৃদয়
এখনো যে এই আমার রাজ্যে—এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা—
ঈশ্বর। যদি নেকড়ে পাল দরজার কোণে ভিড় ক'রে আসে,—
এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা—তবুও কখনো ভুলব না, ভুলব না।

ভাবিনি শুধুই পৃথিবীর বহু জলে রেখা এঁকে
চোখের অতল হৃদের আভায় ধূপছায়া মেখে
গোধূলির রঙে একদিন শেষে খুঁজে নিতে হবে ঘাসের শয্যা ।
ছন্দে ও মিলে কথা বানানোর আরম্ভ কতো! তীক্ষ্ণ লজ্জা
দৃষ্টিতে পুষে হাঁটি মানুষের ধূসর মেলায় ।
চোখ ঠেঁরে কেউ চ'লে যায় দূরে, কেউ স্ননিপুণ গভীর হেলায়
মোমের মতন চকচকে সুখী মুখ তুলে বলে এঁকে-বোঁকে, 'ইশ,
দিনরাত্তির মধুতুক সেজে পল্লব বানায়, ওহো, কী রাবিশ ।'
আকাশের নীচে তুড়ি দিয়ে ওরা যারে কতো রাজা, অলীক উজ্জির
হেসে-খেলে রোজ । তবু সান্ত্বনা : আকাশ পাঠায় স্বর্গ-শিশির,
জোনাকি-মেয়েরা বিন্দু-বিন্দু আলোর নূপুরে ত'রে দেয় মাঠ
গাঢ় রাত্তিরে বিষণ্ণ সুরে তোমার রাজ্যে একা-একা হাঁটি,
আমি সন্ধ্যাট !

শিশিরের জলে স্নান ক'রে মন তুমি কি জানতে
বিবর্ণ বহু ছপূরের রেখা মুছে ফেলে দিয়ে

চ'লে যাবে এই পৃথিবীর কোনো রূপালি প্রাস্তে ?
নোনাধরা যুত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছায়া দেখে, আসন্ন ভোরে
ছ'টুকরো রুটি

না-পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই,
কোনো একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ে'র পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সস্তানুর্ঘে যেমাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জল কথার মিছিল ।

কবিতা
পৌষ ১৩৫৯

হয়তো কখনো আমার ঠাণ্ডা মৃতদেহ ফের খুঁজে পাবে কেউ
শহরের কোনো নদ মাতেই ;—সেখানে নোংরা, পিছল জলের
অগুনতি ঢেউ
খাবো কিছুকাল । যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি
শ্রোত ঠোট চাটে সজ্জায়, তবু শাস্ত্র রূপালি স্বর্গশিশিরে স্নান
করি আমি ।

বুদ্ধদেব বঙ্গুর কবিতা : 'দ্রৌপদীর শাড়ি'

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

বুদ্ধদেব বঙ্গুর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এই পুরোনো কথাই নতুন করে প্রমাণ হ'লো যে, একান্তভাবে ঐতিহ্যসংগত হ'য়েও কবিতা গতানুগতিক না-ও হ'তে পারে, ঐতিহ্যের সঙ্গে কবিত্বের বিরোধের সম্ভাবনা আসলে নিতান্তই কাল্পনিক।

কেননা, 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র অনেক কবিতাই রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি-সৌগন্ধে উদ্ভূত। অথচ, স্পষ্টে রবীন্দ্র-সংক্রমণ সত্ত্বেও প্রত্যেক রচনাই মৌলিক। সেই আশ্চর্য মধুর, মোহময়, অবিশ্বরণীয় স্বরকে অস্বীকার না করে—তাকে আশ্রয় করেই—বুদ্ধদেব নতুন ও বিচিত্র এক স্বরের জন্ম দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং এ-বইকে সম্মুখে রেখে, 'রবীন্দ্রনাথের স্বর একবার ঘর ঘরে প্রবেশ করেছে চিরদিনের মতো অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে', যাইকেল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের এই উক্তি আত্মজীবনী ব'লেই মনে হয়। অথচ এই কবিই বোবনে বাংলার সাধারণত সমাজের 'ভয়ানক শিশু' (infant terrible) ছিলেন, এবং একদা কোনো এক সাহিত্যসম্রাট 'রবীন্দ্রযুগ গত হয়েছে' এই চরম মন্তব্য করে বাংলা সাহিত্যের পায়চারি গোপে কী আলোড়নই না সৃষ্টি করেছিলেন। "High-flying Buddha Bose" এই ব'লে সেদিনের অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

আমরা মনের অবচেতনের তিমিরে
কত যে কথার জোনাকি
লাজুক আলোকে খুঁজে-খুঁজে ফেরে তোমারে—
শ্রাবণ, তুমি তা জানো কি ?

("শ্রাবণ")

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিচয়ই স্পষ্ট ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু, এতৎ-সত্ত্বেও, যে-কোনো বিচারী পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আপাতদৃষ্টিতে

কবিতা
পৌষ ১৩৫২

চমকপ্রদ নতুন না হলেও এরি মধ্যে অনাদ্যাদিতপূর্ব এমন কিছু আছে যার স্বল্প আমাদের কান ও মন এক অপূর্ব ভূস্থিতে ড'রে যায়।

প্রথমত, 'অবচেতনে'র মতো একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে বুদ্ধদেব অবলীলাক্রমে বসিয়ে গেছেন তিন মাত্রার ছন্দে, অথচ কথাটি তার রঙিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে ও-শব্দটি যে পারিভাষিক এ-কথা আমাদের একবারও মনে হয় না। তা ছাড়া, 'জ্ঞানাকি'র সঙ্গে 'জানো কি' বা 'তিমিরে'-র সঙ্গে 'তোমারে'-র মিলও কম চতুর ও মধুর হয় নি : একস্বরের মিল যে মাধুর্যে ও বিন্ময়ে কখনো-কখনো যুগ্মস্বরের মিলকেও ছাড়িয়ে যায়, যারা একস্বরের মিলকে অশ্রদ্ধে ব'লে মনে করেন তাঁদের কাছে এ নিশ্চয়ই এক নতুন আবিষ্কার। এ-ছাড়াও, 'জ্যোপদীর শাড়ি'র "রহস্য" কবিতায় স্নাতকর অধর্মিলের টেকাকে মিলের ছুরির সঙ্গে এমনভাবে স্ক্রকোশনে চালিয়ে দিয়েছেন যে কবিতাটি পড়বার সময় আবিষ্ট পাঠকের পক্ষে তাঁর এই আশ্চর্য হাত-সাক্ষাই দরতে পাওয়া যথার্থই কঠিন। এমনি অসামান্য কারুকার্যের পরিচয় এ-বইয়ের যে-কোনো কবিতাতেই মিলবে--'যে-কোনো' কথাটি এখানে অর্থহীন অতিরঞ্জন নয় : অল্পপ্রাস, নিম্ন ও ছন্দের অভাবিত বিচিত্রতা, স্বর ও ব্যঞ্জনের সূচতুর বিস্তার ('সে-আকুল আশি বছরের কারুকলা'), স্বর ও চিত্রের নিপুণ সংযোজন ('গাছের সবুজে রোনের হনুদে গলাগলি'), দু-একটি অপূর্ব শব্দোচিত্তোর উদাহরণ ('গাছের গায়ে আছাড় দেয় হাওয়ার হিম্মিবিম্বি'), শুবকের সূচক স্বকীয়তা, চিত্র, চিত্রকল্প ও শব্দবন্ধের সজীব, উষ্ণ উপস্থিতি, 'রোদ্দুরের আঙুলে ঝাঁকা মেঘের চেরা সিঁথি', 'অচজ্জচেতন ঘুবা', 'আহ্লাদি-লাল')।

সত্য, অবিরল মহার্ঘতার, পুনরুজ্জ্বল অমিতচারে ও অত্যধিক উদ্ভাসিতপ্রবণতার বুদ্ধদেব বহুর কীবা কখনো-কখনো যথার্থই অবসাদজনক ('কালো চুল', 'কফাবতী') ; সত্য, 'জ্যোপদীর শাড়ি'র কোনো-কোনো কবিতা প'ড়ে এ-কথাও আমাদের মনে হ'তে পারে যে বুদ্ধদেব যেন ভাষার স্বন্দর কোনো নকশা বোনবার অন্তই কবিতা লেখেন ('জ্যোপদীর শাড়ি', 'কাটা'), এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক কথা বসিয়ে যান শুধুমাত্র

কবিতা

শৌৰ ১৩৫২

দুৰ্গাৰ শব্দমোহের বশেই, বাক্যভঙ্গির চাতুৰ্য ও চমৎকারিতার অনতিক্রম্য প্রলোভনে—এ-সমস্তই তাঁর কাব্যের দীৰ্ঘস্থায়ী তারুণ্যলক্ষণ ; তবে, এই সঙ্গে এ-ও যুক্তব্য যে, যে-যত্নশক্তি যে-কোনো উচ্চতর শিল্পের পক্ষে অবৰ্জনীয়, বুঝ্‌মেব বহু তা-ও আয়ত্ত করতে পেরেছেন, কেননা তাঁর অনেক কবিতাই এক কঠোর অত্মপাতবোধ দ্বারা নিরঞ্জিত (“দময়ন্তী”, “কবিতাবনী”, “নির্মম বোধন”, “ছিন্নমূত্র”)। তাঁর নাট্যগীতিকায়া “দময়ন্তী” পড়তে পড়তে বার-বার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কবিকৃত্যকেই স্মরণ করতে হয়, কোনো প্রভাবের জন্ত নয়, এ-জাতীয় শিল্পিক পরোৎকর্ষের তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সম্ভব বলে। মনন ও সংরাগের রাসায়নিক একাত্মীকরণে, ভাষা ও ছন্দের কঙ্কু শাঙ্কুন্দ্যে, বাক্যছন্দের সার্থক প্রয়োগে এবং ঐশ্বৰ্যের মিতন্যাসিতায় “দময়ন্তী” আধুনিক বাংলাকবিতায় তুলনারহিত। ‘প্রৌপদীর শাড়ি’-তে একদিকে যেমন দূর অতীতের পুনরাবৃত্তি, ক্লাস্তিকর আত্মাহুকরণ, অল্পদিকে তেমনি প্রৌড়ির প্রশাস্ত সংযম, নতুন ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সংকেত ; একদিকে যেমন কীটসের মতো বর্ণাঢ্য চাকচিক্য, অল্পদিকে তেমনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় শুভ্র স্বপ্নাভরণ, কবিসাহিত্যের কঠোর মিতাচার। “প্রতিবিম্ব”, “কাতিকের কবিতা” ও “মধ্যাহ্নসের প্রার্থনা”, এ-তিনটি কবিতায় ভাষা ভাবের স্বচ্ছতম আহুনা, বেজস্ত্র জীবনানন্দ দাশের অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছা করে ‘ভাষাই কবিতা’। ছন্দের প্রশাস্ত গান্ধীৰ্ব, শুবকের সুধমা, ভাষার সারল্য, গঠনের প্রতিসাম্য ও ঘনতা এবং ভাবের গভীরতা বার-বার গ্রীক কাব্যাদর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনটি কবিতাই মিল, শুবক ও ছন্দের অভিনব বরনে, প্রত্যেকটি শব্দের অপরিহার্যতা এবং প্রত্যেকটি পংক্তির স্মরণীয়তার বার-বার আবৃত্তি করবার যোগ্য।

২

আমার মতে, বাংলা কবিতার আধুনিক কবিদের সব চেয়ে বড় দান, এক, কবিতার বিষয়ের প্রচলিত সীমারেখার সম্প্রসারণ এবং দুই, এই ঐতিহাসিক ঘটনা : অল্পশ্রুত অন্ত্যজদের জন্ত বাংলা-কাব্যের মন্দিরের দ্বার উন্মোচন,

তথাকথিত, ‘কাব্যিক’ ও ‘অ-কাব্যিক’ শব্দের মিশ্রণ। বাংলায় থাকা কবিতা লেখেন তাঁরাই জানেন, পাঠকের মজাগত কুসংস্কারের চক্রে বাংলা কবিতায় অনেক সমীচীন শব্দ এবং সেই সঙ্গে যত্ন সাবধানে বর্জন ক’রে চলতে হয়, এমন-কি দৈনন্দিন জীবনে যে-সমস্ত শব্দ বা বস্তুর সম্পর্কে সর্বদাই আসতে হয়, আমাদের হার্দ্য কবিতায় তাদের স্থান দেওয়া কত কঠিন। বাংলা শব্দের অর্থায়নটি খুব সহজই হয়, এবং যেমন নৈতিক চরিত্রের সম্পর্কে, তেমনি ভাষা সম্বন্ধেও আমরা নিত্যন্ত উচিৎবোধিত। আজ পর্যন্তও আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভাবতেও পারবেন না যে “মশা” বা “ক্যাডাক”র ওপরও হার্দ্য—এমন-কি মহৎ—কবিতা লেখা যায়, অথচ ইংরেজিতে ডি এইচ. লরেন্স তা-ই করেছেন। প্যাচা, ইঁদুর প্রভৃতি কাব্য-জগতে অনভ্যস্ত জীবকে কবিতায় স্থান দেবার জন্য আধুনিক গুগের সব চেয়ে মৌলিক প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশকে সেদিন পূর্বসূরী আমাদের কোনো-এক অল্পবুদ্ধি সমালোচক ঐতরিক ভাষায় বিজ্ঞপ করেছেন। ভাষা এবং বস্তু সম্বন্ধে এট কুসংস্কার বা উচিতাবোধ হয়তো রবীন্দ্রনাথের অতি দৃষ্ট, অতি নাক্ষিত ভাব-সাধনারই পরোক্ষ ফল, কেননা মধ্যযুগে ইঁদুর ওপ পর্যন্তও তো আমাদের কাব্যের ভাষা ও বিষয় কী চমৎকার বাস্তব। এমন কি, যে বৈষ্ণব-পদাবলী দীপ, সন্দেশ, ফুলের মালার ঐতিহ্যের অন্বনাতা, তাতেও সেদিন এই ধরনের পংক্তি লেখা সম্ভব হয়েছিল

একে দহদহ

ঘসির আগুন

আরে কে না জ্বালে ফুকে।

প্রধানত আধুনিক কবিদের চোঁটার ফলেই (রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক কবিদের অগ্রনায়ক) আজ গল্পকবিতায় যে-কোনো শব্দ বা বস্তুকে স্বীকার ক’রে নিতে বাঙালী পাঠক অভ্যস্ত, কিন্তু পঙ্করচনায় এই মিশ্রণের কাজ—নতুন বোয়ের লক্ষ্য ভাঙানোর মতো—এখনও ধীরগতিতেই করতে হচ্ছে, এবং হয়তো তা-ই করা উচিত। এ-বিষয়ে বুদ্ধিদেব “আগে চলো” নীতিতেই পক্ষপাতী : বাস্তবতার খাতিরে অসংগতি বা বৈস্ময়কে তিনি খুব বেশিদূর মেনে নিতে রাজি নন। বা-কিছু নতুন তিনি করেন সাধারণত আমাদের

‘প্রতিভা’, সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সাধারণ পাঠকের সংস্কার ও কৃতির সঙ্গে আন্তে আন্তে খাপ খাইয়ে নিতে করতে চেষ্টা করেন। পারিভাষিক শব্দ, বিদেশী শব্দ, প্রত্যাহ-ব্যবহার্য শব্দ বা বস্তু, অতি পরিচিত ভৌগোলিক নাম, এমন-কি বৈজ্ঞানিক তথ্যকেও তিনি অসামান্য করে তুলতে পারেন এবং পারিপার্শ্বিক কাব্যিক আবহাওয়ার সঙ্গে এমন বেমানাম মিলিয়ে দিতে পারেন যে, সব মিলিয়ে যা সৃষ্টি হয় তা একটা সংগীত, একটা সুন্দর সামঞ্জস্য। আমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করি

- (১) ঘাস, গাছ, ঘোড়ার অস্ত্রহীন আশ্রয় কাপড়ে
- (২) ঝরিয়ে আলো আকাশে, যেন যৌন মিনেয়ার
- (৩) যেন তীব্র তপ্ত বেগ স্তম্ভিত কল্পিত মোটরে
- (৪) মায়াবী টেবিলে কুটিল-কঠিন হীরকে

চিকিৎসা-শাস্ত্রের নীরস তথ্যও তাঁর হাতে কাব্যের লোকাভীত সৌন্দর্য লাভ করে

- (১) উদ্যান্ত সূর্য মিলে উজ্জীবনী শোণিত-শর্করা
বিন্দু-বিন্দু তোমার শিরায় ঢেলে...
- (২) সেবক-শোণিত কণার কঠিন বধির অবাধ্যতা

ভূটি ঘটনাই আড়কের দিনে আমাদের জীবনে খুবই পরিচিত। নিচের ভূটি উদাহরণ আমার কাছে চূড়ান্ত বিশ্বয়কর বলে মনে হয়েছে :

- (১) রাত্রি নিদ্রাতুর।
বৃষ্টির ঝর্ঝর স্বর ঝরিয়ে মধুর
স্বপ্নের অম্পটে মহাদেশে।
যেন দীর্ঘ যাত্রাশেষে
সুদূর সমুদ্রভালে দীর্ঘ নীল ঢাকা
জলে আমেরিকা। (‘দময়ন্তী’—ছন্দ)

- (২) কলকাতা ঝরে এক ফোঁটা মধু
অসীমের শতদলে। (‘রূপান্তর’—সেতু)

কবিতায় বহুশব্দ, সুদূর, সংগীতময় ভৌগোলিক নামের ব্যবহার এর আগেও কোনো-কোনো কবি সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন। কিন্তু ‘আমেরিকা’ বা ‘কলকাতা’র মতো অতিপরিচিত ভৌগোলিক নামের—যাকে আমরা প্রত্যাহ

কবিতা

পৌষ ১৩৪২

সংবাদপত্রে একশোবার ক'রে দেখছি—এই কাব্যিক রূপান্তরণ এ-কথাই প্রমাণ করে যে বুদ্ধদেব কত বড় কাককর্মী। কে বলবে 'আমেরিকা' বিত্তহীন সংস্কৃত শব্দ নয়, সংস্কৃত শব্দের কোনো রূপকথার রহস্যময় বীণ নয়, পুরাতন-স্মৃতি দর্শন, বিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, উচ্ছ্বাসের সমগোত্র নয়? কিন্তু কলকাতার ব্যাঙনা আরো গভীর। কলকাতা এখানে আর আমাদের কোলাহলমুখর অতিব্যস্ত, স্বার্থের সংঘাতে উন্মত্ত, উন্মত্ত, দৈনন্দিন কলকাতা নয়, অসীমের শতমলের এক ফোঁটা মধু। কল্পনার বিশালতায় জীবনানন্দ দাশের 'বোম্বাই'-এর দুঃসাহসিক কাব্যিক রূপান্তরণের সঙ্গেই এর তুলনা, কিন্তু এর ব্যাঙনা আরো অনিশ্চয়, আরো স্বদূর।

৩

কাব্য-জীবনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই বুদ্ধদেব বহু ভাষা ও ছন্দ নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছেন তার সঠিক মূল্য নিকরপণ করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সর্বগ্রাসী কবিকৃত্য এবং সেই সঙ্গে উত্তরসাধকের মনে অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্রসম্মোহের কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হয়। সত্য, পূর্বজের দান বহুমুখ; কিন্তু তৎসঙ্গেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে আধুনিক কবিরাজ নতুন কিছু দিয়েছেন এ-কথাও অবিস্মর্তব্য। হয়তো তুলনার আধুনিক কবিতার মিলিতকর্মও পরিমাণে সামান্য ব'লেই মনে হবে; তবু, আর কোনো কারণে না হলেও ভবিষ্যতের ভিত্তি-প্রস্তর ব'লেই এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে তার জ্ঞান মূল্য দিতেই হয়; এবং যদিও এর অনেক কিছুই এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার অনিশ্চয়তার কণ্টকিত, তবু সাফল্যের কসলও কিছু-কিছু ঘরে তোলা হয়েছে, এ-ও ঠিক। 'বাকছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন' সাধনে বুদ্ধদেব যে-সফলতা অর্জন করেছেন, বাংলা কবিতার ছন্দ ও ভাষাকে সেটাই রবীন্দ্রনাথ থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে, এ-কথা বললে, আশা করি, কবিতাককে অসম্মান করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দকে যা দিয়েছেন তার নাম "লাবণ্য"। পঞ্চাশের বুদ্ধদেব যা দিয়েছেন তার নাম "পৌরুষ"। বাংলার অসংখ্য কবির তুলনায়, সম্ভবত এক জীবনানন্দ দাশ

বাদে, রাবীন্দ্রিক পদ্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে :

রবীন্দ্রনাথ :

যৌবন-বেদনা-রসে উজ্জল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অশ্রু মনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী ।

স্বধীন্দ্রনাথ :

হেমন্তের উর্দ্ধ্বাস শীতের
উদ্বাস কালের পায়ে ঝিল্লীর মণীর হবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে...

বুদ্ধদেব

তাড়'নে উজ্জলতর করো নীপ, মায়াবী টেবিলে
সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও, যে-আলোর বীজ
ভরা দেহ হৃদয়ীর, যার গান সমুদ্রের নীলে
কাপায়, ভ্রোহুনাথ যার ঝিলিমিলি স্বপ্নের শোভিত
নিশ্চিন্তা জাহাজেরে ডাঙে এনে পুরোনো পাথরে ।

নির্বাচিত অংশে রবীন্দ্রনাথ বা স্বধীন্দ্রনাথের পদ্যেরে দৃঢ়তা আছে, গতিও আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ যেন তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজের পায়ে জোর ক'রে দাঁড়াতে পারে নি, তার সম্পূর্ণ এবং স্ফায়া মূল্য বা ওজন পায়নি, এ-পদ্যেরে সাদৃশ্য মুখের কথার সঙ্গে নয়, গানের সঙ্গে। কিন্তু বুদ্ধদেবের পদ্যেরে প্রত্যেকটি শব্দের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকটি শব্দকে তার সম্পূর্ণ ওজন দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের পদ্যের মধুরতর; কিন্তু বুদ্ধদেবের পদ্যেরে স্নায়বিক দৃঢ়তা ও বাকছন্দের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য রাবীন্দ্রিক এবং আধুনিক অস্ফাট কবির পদ্যেরে তুলে। অথচ এ-অস্ফাট স্বধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দেব যতো তাঁকে তুর্গম সংস্কৃত শব্দের 'খার' হ'তে হয় নি।

ইংরেজি ভাষার চরিত্রের সঙ্গে ধাতা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে ল্যাটিন শব্দের ধ্বনিনির্দেশ বেশি হ'লেও ছোট একটি টিউটনিক শব্দের

কবিতা।

পৌষ ১৩৫২

নথো যে ঘোর আছে, স্বরূপ ল্যাটিন শব্দের তা নেই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বহু-
উদ্ধৃত

No motion has she now, no force :
She neither hears nor sees;

এই দুটি পংক্তিতে সরলতার সঙ্গে বলিষ্ঠতার যে-মিলন ঘটেছে মিলটনের সমগ্র
Paradise Lost কাব্যে কোথাও তা আছে কিনা সন্দেহ। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে
বুদ্ধদেব এই গোপন কথাটি জানতে পেরেছেন যে কবিতায় আমাদের এতাহ
ব্যবহৃত প্রাকৃত বাংলা বা কথা রীতি ব্যবহার করলে যে-ঘোর আসে, এতদ
সংগায় হুহু সংস্কৃত শব্দের ইম্পাক্ট-সৈন্য সাক্ষালেও তা কখনোই সম্ভব নয়।
'তরু' না ব'লে গাছ, বা 'তৃণ' না ব'লে ঘাস বললে ভাষা যে কত ফোরালো এবং
স্বাভাবিক হয় 'দয়াদায়ী'র "নির্মম ঘোবন" কবিতাই তার প্রমাণ।

বিষ্ণু দে যেমন যাত্রাবৃন্তের তেমনি বুদ্ধদেব পদ্মারের কবি ব'লেই পাঠক-
সমাজে পরিচিত। কিন্তু 'প্রৌপদীর শাড়ি'তে বুদ্ধদেব যাত্রাবৃন্ত ছন্দকেও
অদিকর্তার আশ্রয়বিলাস ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে আমাদের সম্রাট
করতাসি কেড়ে নিয়েছেন, এবং এ-ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাব-অনুযায়ী হুঃসাহসিক
মৌলিকতার অমূল্যদান করেছেন। বিষ্ণু দে যাত্রাবৃন্তের ধর্ম বায়বীয়তা, চপল-
ধর্ম গীতি-উজ্জলতা তার নেই। তাঁর যাত্রাবৃন্ত ('কার্তিকের কবিতা',
'প্রতিবিম্ব') তুলনায় সনল, শান্ত, স্বদৃঢ়, ঈষৎ দিবানন্দ-গভীর কিন্তু অস্বস্তিক,
শান্ত অথচ সাবলীল, স্বদৃঢ় অথচ নমনীয়। একদিক দিয়ে যাত্রাবৃন্ত ছন্দে
বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলায় যথার্থই দ্বিতীয়স্থিত, তবু, কবকের অভাবিত
গঠন ও বিকাশ সবেও, বাবৌত্রিক যাত্রাবৃন্তের সঙ্গে তাঁর যাত্রাবৃন্ত বুদ্ধদেবের
তুলনায় ঘনিষ্ঠতর। বুদ্ধদেবের মৌলিকতা এই যে, তিনি যাত্রাবৃন্ত ছন্দেও—
যাকে আমরা চিরকাল গানের ছন্দ ব'লে ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলাম—বাক-
ছন্দের আভাস জানতে পেরেছেন। আভাস, কিন্তু যাত্রাবৃন্তের স্বাভাবিক
প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে একে এক হুঃসাহসিক বলাই উচিত। অবশ্যই
'তাহ'লে উজ্জলতর করো দীপ' আর 'কীটসের ডাক এসেছিলো ছাঙ্কিনে'
এক নয়, কিন্তু 'শয়নশিয়ারে প্রদীপ নিভেছে সবে' বা 'অন্ধ কাহারো রাধি না

অকৌকার' যাত্রাসংখ্যার সমতা। সবেও 'কীটসের ডাক' থেকে আলাদা। শুধুমাত্র গণিতের সাহায্যে কবিতার ছন্দের বিচার ক'রে আমরা যে কত বড় ভুল করি, এই পার্থক্যই তার প্রমাণ। আসলে কবিতার ছন্দের শেষ বিচারক গণিত নয়, শুধু সংখ্যার সাহায্যে কবিতার ছন্দের বিচার করবার যে-পদ্ধতি ছন্দোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত, আমার কাছে তা অতি-সরলীকরণের দোষে ছুটে ব'লে মনে হয়। 'কীটসের ডাক' এবং 'শমুনশিরবে' উভয়েরই যাত্রাসংখ্যা চোদ্দ, কিন্তু ধারাই কান আছে তিনিই বলবেন যাত্রাসংখ্যা এক হলেও এ দুয়ের ছন্দ বা ধ্বনিগুণ ঠিক এক নয়, যদিও উভয়কেই 'যাত্রাবৃত্ত' এই এক নামেই ডাকা যেতে পারে। 'কীটসের ডাকে' সুরের টান একেবারে অসুপস্থিত নয় সত্য, কিন্তু আগাগোড়া একটা কথোপকথনের ঢং বজায় রাখবার ফলে কাব্যরীতির উঁচু সুরের সঙ্গে এমন একটা অসুরধতার নিচু সুর লেগেছে যে, পাঠক বৃহত্তেই নিজেকে কবির একাধ বন্ধু ব'লে অনুভব করেন। বুদ্ধদেবের আরো কৃতিত্ব এই যে, কাব্যরীতির উঁচু সুরের সঙ্গে কথারীতির এই নিচু সুরের মিশ্রণ—'কঙ্কাবতী'র পর—তার কাব্যে কদাচিত্ রসাতলের স্রস্বদাতা, বরং প্রতিভুলনার ফলে কবিতার 'ভালো লাইনে'র স্বাদ অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বুদ্ধদেবের কাব্যে কাব্যরীতির সঙ্গে কথা রীতির প্রায় অধনারীতির সম্বন্ধে সাধারণ কথার ফাঁকে-ফাঁকেই কবিতার বিছাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, অথবা সহজ কথোপকথনের ঢঙেই, যথাসম্ভব খাস্তাবিক ভাষায়, সুর খুব উঁচুতে না তুলেই, তিনি অসুরের গভীরতম অসুস্থতি বা জীবনের মহত্তম সত্যকে প্রকাশ করেন। কোনো-কোনো পংক্তিকে আমার মহাকাব্যের বিশাল নগড়ার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছা করে। য্যাথু আর্নল্ড ঘাকে বলেছেন 'touchstone line' বা নিকষ পংক্তি, আমার মতে নিচের দুটি পংক্তি তারই উদাহরণ :

তবু জীবনের বিষণী মাধুরী
কমবে না একভিনয়।

কত সহজ, কত সাবলীল তাঁর যাত্রাবৃত্ত :

ঐশ্বর্যশ্রমিক, বর্ষাবিলাসী আমি
দীর্ঘশ্রুজী দিবস আমার প্রিয়,

- তবু এ-নবীন হেনসৃদিন ঘেন
মাঝে-মাঝে মোর মনে হয় রমণীয় । (“কাভিকের কবিতা”)
- বা এই তো সেদিন বৈশাখ ছিলো
দীপ্তরেণায় আঁকা,
মনে হয় যেন মুখ ফেরালেই
পাবো আবেগের দেখা । (ঐ)
- বা ভাবতে পারি না একটি বছর
গেলো এত সহজেই । (ঐ)
- বা কিন্তু তখন, বলা বাহুল্য
বয়স মতেই ছিলো । (“প্রতিবিম্ব”)

৪

বুদ্ধদেব বহুর বিকল্পে প্রচলিত মন্তব্য—যা কোনো এক পক্ষ থেকে কিছু-কাল হোল নালিশের আকারে শোনা যাচ্ছে—এই যে, তিনি নাকি যথেষ্ট পরিমাণে সমাজসচেতন (শ্রমীসচেতন ?) নন । কবির পক্ষে ‘যথেষ্ট পরিমাণে সমাজসচেতন’ হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় কিনা সে-বিষয়ে আমার যোরতর সন্দেহ থাকলেও সেদিক দিয়ে তর্ক না তুলে আমি বলব যে, প্রথমত, যদিও বুদ্ধদেবের কাব্যে বিদ্রোহ-কষাঘ্নিত বক্তাক্ত কোনো দুঃপ্রচার নেই, এবং সাধারণত তা উপদেশাত্মকও নয় (খুব কদাচিত্ তাঁর কাব্যে ইমকুনমাস্টারি করে), তবু, প্রথমত, যুগের স্পন্দন—আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিষাদ, সমস্যা, সন্দেহ, সংঘাত (‘দময়ন্তী’—“কবি-জীবনী”, “পূর্বরাগ”, “বিবাহ” ; ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’—“কাভিকের কবিতা”) তাঁর কাব্যে অক্ষুপস্থিত নয় (‘দময়ন্তী’র “কবি-জীবনী”-কে তো আমার এ-যুগের মহাকাব্য বলতে ইচ্ছা করে, একটা সমস্ত যুগ এতে বিধৃত : আধুনিক কালের বেদনা, বিষাদ, স্বপ্ন এতে পরাৎ-পর ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি । যুগপ্রবৃত্তিকে এখানে তিনি সেই সমৃদ্ধতর, নৈব্যক্তিক, বৈশ্বিক এবং অলৌকিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন যে-স্তরে পৌছলে সর্বধ্বংসী মৃত্যুও পরাস্ত । (আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, বুদ্ধদেব বহুর ‘কবি-জীবনী’ মহাকালের টেবিলের ওপর চিরকালের

অশ্রু খোলা রয়েছে, পক্ষান্তরে ছেঁড়া-কাগজের খুঁড়িতে সমাজচেতনার নাম নিয়ে এ-যুগের দলভুক্ত কবিরা যে-সমস্ত কবিতারূপী ইচ্ছাহারপত্র লিখেছেন তার সবগুলিই নিষ্কিণ্ণ।) এবং, বিতীর্ণত তার চেয়েও যা বড় কথা উপদেশাত্মক যে-কোনো বিপুল গ্রন্থসংগ্রহের চেয়ে তাঁর কাব্যের সখা সাধুজ্ঞা সমাজ-মানসের পক্ষে ঢের বেশি হিতকর ; সুতরাং যদিও সমাজ-সংস্কারক বা ভাবিকথকের উদ্দীপনা তাঁর নেই, তবু তাঁর কাব্য সমাজের পক্ষে আদৌ অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই, বরং যেহেতু তা, মোটের উপর, স্বাণ্যকর, এই নৈরাশ্রীপীড়িত, সন্দেহ-কুটিল, বিবেক-বিহীন, স্বার্থের সংঘাতে উন্মত্ত, অস্থির যুগে—এই অস্থির 'কালো হাওয়া'য়, সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ যখন জীবন-বিবেকের আত্মঘাতী মানসতায় পর্যবসিত, জীবনের যখন কোনো মূল্যই নেই, না নিজের, না অপরের, মৃত্যুরও কোনো মহিমা নেই—দুঃসংসার বহুর মতো কবির আবশ্যকতা আরো বেশি নিশ্চিত। দুঃসংসারের কাব্য সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, জীবন তাঁকে কখনো কখনো নিরাশ করলেও, এবং স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের, সাধনার সঙ্গে সিদ্ধির বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে, পোকায়-কাটা সমাজের নোষ ক্রটি, অসম্পূর্ণতা ও নিলজ্জ বৈষম্য সম্বন্ধে, এ-যুগের অচ্ছাদিত কবির মতো একান্তভাবে সচেতন হ'য়েও, জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন—প্রেমিকের মতো—এবং সে-ভালোবাসাকে পাঠকচিহ্নে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারেন—দীপ থেকে দীপের মতো। আর, তাই, বিশেষ কোনো জীবনদর্শন বা বিশ্বাসের সুসমঞ্জস প্রকাশ এবং পরিবর্ধন তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা না গেলেও, জীবনের প্রতি এই ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যকে এক মহত্তর পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বর্তমান যুগের প্রধান দুটি ব্যাধি নৈরাশ্র-ও-ক্রান্তি এবং হিংসা—Aldous Huxley যার প্রথমটির নামকরণ করেছেন *acedia* (আধুনিক যুগের এই দুই প্রবৃত্তিকে আমি একসঙ্গে দেখছি, কেননা এ দুটিই একই সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার এপিঠ-ওপিঠ : একটি নেতিবাচক, অন্যটি ধ্বংসকর অর্থে সন্দর্ভক, এইমাত্র ভ্রম), এই যুগ বিকৃতির বিতীর্ণটি থেকে দুঃসংসার বহুর কাব্য দেবতার

যতোই যুক্ত ; তবে যুগের সর্বব্যাপী নৈরাশ্র, এমন-কি শুভনাটিকা, তাঁর কাব্যেও যে ছায়াপাত না করেছে এমন নয়, এ-কথা আমি একটু আগেও বলেছি। কিন্তু, স্বস্তির কথা, যুগের ব্যাধিতে ভুগেও তাঁর যুগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়নি, এক অসাধারণ জীবনীশক্তিবলে সমস্ত ব্যাধি, সমস্ত বিকৃতিকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন। 'তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী কয়বে না একতিলও।' তবু, অর্থাৎ জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা আছে সত্য, তবু শেষ সত্য তাঁর 'বিজয়ী মাধুরী'—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সত্যেরো বছরের অমুভবের কথাই বুদ্ধদেব এখানে বলেছেন, তবু সমস্ত দ্বিধাভ্রমের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তের দিকেই তাঁর কাব্যসাধনার শেষ লক্ষ্য ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু, এতৎসঙ্গেও, এ-কথা অবিস্মর্তব্য যে বুদ্ধদেব এ-যুগেরই কবি। প্রত্যেক মহৎ কবি নিজের কথা বলতে গিয়ে যুগের কথাই বলেন, 'in writing himself, writes his time', এলিয়টের এ-মন্তব্য বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এ-ও ঠিক যে কোনো-কোনো কবি শুধু যুগ-প্রকৃতির সীমানাতেই বন্দী থাকেন না, তাকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকেও—অর্থাৎ পূর্ণতর জীবনের দিকেও—পদক্ষেপ করেন।

বুদ্ধদেব বহু যুগের কবি হ'য়েও যুগকে ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর সমস্ত কাব্যসাধনা এই ছাড়িয়ে ওঠারই ইতিহাস। তাই, একদিকে সাম্যবাদের মূলনীতিতে বিশ্বাসী হ'য়েও—কে-ই বা তাকে অবীকার করে?—এবং তাঁর ভাবধারায় একদা প্রভাবান্বিত হ'য়েও, বুদ্ধদেব কদাচিৎ কালপুতলির দাসত্ব করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের যাবতীয় চোরাগর্তগুলি চিনে ফেলতে তাঁর খুব বেশি দিন লাগেনি। বুদ্ধদেব কখনোই কবি ও কর্মীর মৌলিক পার্থক্য ভুলে যান নি, লেখনীকে অসাহিত্যিক প্রচারকর্মে নিযুক্ত করেন নি বা হারিয়ে ফেলেন নি জীবনের মৌল মূল্যবোধ। এমন কি, বুদ্ধিজীবীর হৃদয়ে সাম্যবাদের সেই গৌরবময় সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগেও, তাঁর কাব্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে, বিবাদ আছে, কখনো-কখনো সমাজব্যবস্থার তীব্র, সূক্ষ্ম, বিজ্ঞপায়ক সমালোচনাও আছে, কিন্তু রক্তপিপাসা হিংসা বা সাম্প্রদায়িক প্রচারকর্মের নাম-গন্ধ নেই। অন্তরিকে কোনো-কোনো আধুনিক

কবির মতো বুদ্ধদের আগাগোড়া কোনো নেতিবাচক দর্শনের কালো চশমা চোখে প'রে জীবনটাকে দেখতে চেষ্টা করেন নি, ভুল করেন নি সেলাইয়ের উলটো পিঠকেই জীবনের একমাত্র রূপ বলে। তাই তো তাঁর মন কখনো 'নিঃস্বর' হোল না, তাই তো ঘাস, গাছ, বোদ্ধুরের ডাকে আজও তিনি উত্তর দিতে ভোলেন না, এবং কি গল্পে, কি পল্পে, শব্দের এবং প্রকরণের অক্ষুরত্ব রহস্যের অহুস্কানের অক্লান্ত উৎসাহ এবং সাকল্যের আনন্দে তাঁর রচনার প্রত্যেকটি পংক্তি সমৃদ্ধ। তাই তো তিনি এ-যুগেও লিখতে পারেন

পৃথিবীর যৌবনের দিন

ষাদের হৃদয়ে অস্বাভীন, জীবনের উন্মাদ নবীন

গ্রীষ্ম ষাদের বাহুতে বীণা :—সেই সব নবদম্পতীরা

স্বধী হোক, আহা, স্বধী হোক।

("পৌষ সংক্রান্তি")

বা

দৈব দৃষ্টি কিছু যদি থাকে দাবি,

তবে যেন আমি বাঁচি

এক শ্রেণি বছর, অস্বস্ত কাছাকাছি

("প্রতিবিশ্ব")

বা

মনে-মনে আমি তারই দিন গনি—

বেঁচে থাকা তবু ব্যর্থ হয়নি,

শাস্ত প্রবীণ হেমন্ত দিন

তা-ও লাগে সুমধুর।

("কাভিকের কবিতা")

বাংলা সাহিত্যের বহু প্রতিভাবান কবির অকালবৃত্তান্ত একেত্রে শিক্ষাপ্রদ : কেন স্বধীক্রনাথ, সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর লিখতে পারলেন না, কেন ইংরেজি বাংলা আধুনিক যুগের অনেক কবিতাই এত বৈচিত্র্যহীন, এ প্রশ্নের উত্তর আজ নিশ্চয়ই ভালো ক'রে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic band,
And puts a record on the gramophone.

এলিসটের এ-পংক্তিগুলি অত্যন্ত মুখরোচক স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলতে হয় যে এই শুভনাস্তিক্য সহজ কবি-প্রেরণার অন্তরায়, এবং যাহুর

ও জীবনের প্রতি এই উন্নাসিক মনোভাব নিয়ে কখনোই বেশি দিন কবিতা লেখা চলে না। বুদ্ধদেব বহুর সহজাত কবি-প্রবৃত্তি—যাকে বলতে পারি তাঁর চারিত্র, কবির চারিত্র—এ-ক্ষেত্রে তাঁকে বাচিয়ে দিয়েছে। আর, এই চারিত্র আছে ব'লেই নিম্নার ক্রোধান্ত জিহ্বাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অবিচল সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে বাচিয়ে রেখে দৃঢ়পদে ধাপে-ধাপে উঠে ক্ষেতে গেরেছেন। এবং সেইজন্যই তো এ-কথা তিনি বলতে পারেন—

আবার আকাজ্ঞা তাই কবির অবিচল ব্রত

আর সে-প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে চলতে পারেন। কোনো-কোনো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মতো 'অন্ত, হীন প্রভু'র দাসত্ব আর পর্যন্তও তিনি মেনে নেন নি। তাই শুধু তাঁর বিশ্বদকর কবি-প্রতিভার অন্তই নয়, হা না থাকলে অন্য সবই বার্থ হোত, সেই চারিত্র—কবির সেই চারিত্রের অন্তও বুদ্ধদেব বাংলার তরুণ কবিসমাজের নবমুখ।

সমালোচনা

দূরের আকাশ, অরুণকুমার সরকার । মিত্রালয়, ২,
অবতামসী, আবার রাজি, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় । কবিতাভবন, ২,
মিলিতা, শ্রীমীলচন্দ্র সরকার । প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৫০ ও ১২

তিনজন কবির প্রথম কবিতার বই একসঙ্গে হাতে পাওয়া সমালোচনার পক্ষে ভাগ্যের কথা—যখন বইগুলিতে স্বকীয়তার আনন্দ থাকে । আলোচ্য বই তিনটি, অত্যন্ত স্বল্পের বিষয়, নেড়ে-চেড়ে রেখে দেবার মতো নয়, নেড়ে-চেড়ে বার-বার পড়বার যোগ্য—আর যে-লেখা বার-বার পড়া যায় না, তা, আর যা-ই হোক, কবিতা যে কখনোই নয়, এ-কথা কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন । এই তিনজনের লেখাতেই বস্তু আছে, বিস্তার আছে, আর আছে সেই সরসতার স্তম্ভ, যা এ-যুগের নিপুণ লেখকদের রচনাতেও সব সময় পাওয়া যায় না । তিনজনেই কলাকৌশল বিষয়ে সচেতন, ভাষায় ত্রাতাধর্মী, এবং অভিনব বিষয়বস্তু সন্ধান করতে সচেষ্ট । তিনজনের লেখাই আধুনিক কালের লক্ষণযুক্ত, তাতে দেখতে পাই নৈরাশ্রের ছায়া, স্বপ্নের বেদনা—কিন্তু সব সংশয় পেরিয়ে জীবনের উপর বিশ্বাস যে এঁরা রাখতে পেরেছেন, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার স্বাস্থ্য প্রত্যাবর্তনের পরিচয় পাওয়া গেলো ।

এই-যে সামান্য লক্ষণগুলোর কথা বললাম, পাত্রেভেলে তার তারতম্য অবশ্য আছে । কলাকৌশলে সবচেয়ে নিপুণ অরুণকুমার সরকার, ভাবের বৈচিত্র্যও তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ; ‘দূরের আকাশ’র চমক পৃষ্ঠার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিচিত্র ছন্দে দত বিভিন্ন মানসিক অবস্থা বা mood-এর সাক্ষাৎ মেলে, তরুণতর কবিদের রচনায় তার তুলনা চট করে মনে পড়ে না । ব্যঙ্গ, পরিহাস, হৃদয়বেগ, জীবনানন্দের পরবর্তী ধরনে পেঁচিয়ে-বলা অস্পষ্টতা থেকে সরল, অন্তরঙ্গ উচ্চারণ, এবং গল্প যেকালের আটোঙ্গাটো ডার্কিক পঙ্ক—অরুণকুমারের লেখনী এর কোনোটাতেই অপ্রস্তুত হ’য়ে পড়ে না । সবগুলোতেই তার কৃতিত্ব সমান এ-কথা বলবো না, তাছাড়া এই ক্ষুদ্রাকার—এবং লেখকের প্রথম—বইয়ের মধ্যে এত স্বল্প বিভিন্ন স্বরযোজনা অমিশ্র প্রশংসার কথাও নয় । এর ফল একটা হয়েছে এই যে ‘দূরের আকাশ’ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হ’তে পারেনি, বরং যেন ‘নির্বাচিত কবিতা’র মতো মনে হয়—এবং সেখানেও নির্বাচনের ঐচ্ছিক সন্ধে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশয় জাগে । আর-একটা কথা এই মনে হয় যে অরুণকুমার যেন এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনে পরীক্ষা ক’রে যাচ্ছেন মাত্র, নিজের কথা নিজের মতো

কবিতা

শ্রী ১৩৪২

ক'রে বলবার বিজ্ঞা তাঁর আদ্যস্ত হৃদয়। কিন্তু তবু, তাঁর মনের স্বাভাবিক ঝোঁকটি যে কোন দিকে, এবং কেমন ক'রে বললে তাঁকে সবচেয়ে বেশি মানায়, সে-কথাটি পাঠকমাজেই বুঝতে পারবেন, অতএব তাঁর নিজের কাছেও নিশ্চয়ই গোপন নেই। 'দূরের আকাশে' ব্যঙ্গ, তর্ক, অল্পনা সবই আছে, কিন্তু সেখকের যেটি গভীরতম, আপনতম সুর, সেটি প্রকাশ পেয়েছে হার্ম্য কবিতায়। 'রবীন্দ্রনাথ' নামক কবিতায় প্রবীণ ও নবীন কবির বিতর্কটি গম্ভ-পঙ্কের অবাধ মিলনের একটি নিখুঁত নিদর্শন, দু-একটি ছোট গম্ভ কবিতায় কোতুকচিত্রও উৎরে গেছে, কিন্তু বই খুলেই প্রথম যখন পড়ি—

সিন্দুক নেই, স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিকালক বাস্তব।
ত-দুটি গোপন তাকানিকের
পার কি পরশ হংসামাক্ত ?

আর 'ক্রিসাফিনায়' কবিতায় একটু ছন্দে যখন বেদনার সুর লাগে —

ভালোবাসা তুমি সূর্য পথচিল
অনেক দূরের নীলে।
খাল মনে হয় হঠাৎ বা নর সুল
হঠাৎ বা ডেকে'ছলে।

তখনই এই কবির জাত চিনতে আমাদের দেয়ি হয় না। আসলে এই সূর্য স্তবক দুটি তাঁর রচনার মধ্যে আকস্মিক নয়, এই বইয়ে অসংখ্য পাঁচটি-ছ'টি কবিতা আছে যাতে অসুভূতির পলাতক পাখি বাণীর প্রেমে বন্দী হয়েছে—এই ঘটনার অর্থ বে কতখানি তা মনে রাখলেই সংখ্যাটাকে নগণ্য ব'লে মনে হবে না। আমি তো মনে করি যে

বৃষ্টিতেজা বাড়ির মতো বহুস্তম
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।
কত দিনের কত রাতের কাগসা তুলির
রঙে রেখার আঁকা আমার একটু সময়।

এই রকম একটি ক্ষুদ্র, সুসম্পূর্ণ, ইন্দ্রিতম কবিতা লেখার ক্ষমতা যে-কোনো কবিই ভাগ্যবান হওয়া প্রয়োজন, এবং এ-রকম একটি কবিতাও যিনি লিখতে পেরেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক আশা থাকলো।

বিশ্ব বন্দোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে অনেকদিন ধ'রেই আমার পরিচয় আছে, আমাদের তরুণতর কবিদের মধ্যে তাঁকে আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁর রচনার ঝোঁক লালিত্যের দিকে, ছন্দে-মিলে স্বাক্ষর পদবিদ্যাসের দিকে

(তিনি যাত্রার ছন্দই তিনি বেশি ব্যবহার করেন), এবং যদিও একটু প্রকট অস্থপ্রাসের লোভ কখনো-কখনো তিনি সামলাতে পারেন না, এবং অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও মাঝে-মাঝে অসংগতভাবে ব্যবহার করেন, তবু তাঁর ‘অবতামনী’ আবার স্বাভাবিক মোটের উপর একটি ভাবুক চিন্তের আর সেই সঙ্গে একজন সাবধানী কারুকারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো।

এ-জীবনে কতো প্রাণ হার হ’রে গেলো—

কতো গান।—তারে দান দিক এ-কবিতা।

বইয়ের এই প্রথম কবিতা অনেকের মনেই অম্লবর্ণন জাগবে, এবং ‘ময়লা গলির উপকথা’র মতো দীর্ঘতর নাটকীয় কবিতার একটু স্বতন্ত্র রকমের গঠনশক্তিরও পরিচয় আছে। নাটকীয় মানে সংলাপে বিস্তৃত নয়, কোনো-একটি কাহিনীতে আশ্রিত, কিংবা কাহিনীটি প্রচ্ছন্ন বেধে মস্তবোর স্বগতভাষণ। লিঙ্গিক নিষেধ লেখক অনধিকারী নন, বইয়ের অনেক কবিতাই প্রণয়ঘটিত, কখনো চপল, কখনো বিষন্ন, ভাবের সঙ্গে ছন্দ, ভাষারও যথোচিত বদল হচ্ছে। ‘প্রণয়-প্রেক্ষা’, ‘মরা সাধ’ রূপায়ণের মনোহর দৃষ্টান্ত, কিন্তু বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটা বড়ো জগতে আমাদের নিয়ে গেছেন ‘আমাদের পতক’ নামক কবিতায়, যেখানে একটি উজ্জল সকালবেলাকে একটি পতকের স্বপ্নজীবী প্রাণ দিয়ে তিনি অম্লভব করেছেন। এই জীবন-বন্দনার পাশে-পাশেই জরাচেতন, মৃত্যুচেতন অনেকগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো ‘কোনো মৃত্যুর শিয়রে—আবহমান’।

যদিও যেবে থাকবেই লেনে তোমার দেহের কণা

—এই কথা জুলবো না।

নদীজলে গলে যিশে বাবে কোনো তোমার দেহের কণা

—এই কথা জুলবো না।

বে-বাটিতে গাছ জ্বল হ’রে কোটে—তোমার দেহের কণা

—তারও কথা জুলবো না।

আকাশে বাতাসে বে-জাই ছড়াবে তোমার দেহের কণা

—তারও কথা জুলবো না।

এই মন্ত্রের মতো পুনরুজ্জ্বলিত এমন একটি উচু সুর লেগেছে যা আবার এবং বার-বার ধরতে পারলে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তিমান হবেন।

‘মিলিতা’ শব্দকে আমার দুটি আপত্তি আছে। প্রথমত নামের অস্ত : এ-রকম নাম বিধের উপহারে উদ্ভিষ্ট হ’লেই মানায় ; দ্বিতীয়ত আকারের অস্ত, এ-রকম চিহ্ন প্যান্ফলেটের মতো চেহারায় কবিতার মর্যাদা রক্ষা হয় না—বিশেষত

কবিতা

পৌষ ১৩৫২

লেখক যদি সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হন। আপত্তি ছুটি নিবেদন করবার কারণ এই যে সুনীলচন্দ্র সরকার বীতিমতো ভালো লেখেন, তাঁর রচনায় বৈশিষ্ট্য আছে—যে-চোখে তিনি চরিত্রের দিকে তাকিয়ে জ্ঞাথেন তাতে কৌতূহল আছে কিন্তু আপত্তি নেই। এবং কবিতার ভাষায় কথ্যরীতির সম্মান বেগ সঞ্চারিত করতেও তিনি সক্ষম :

এই খোলা পথে চলতে চলতে
মনের কথা কি পারবো বলতে ।
বাঁওয়ায় ভাড়ায় আড়ে নিই দেখে
মাঠের চাকাটা চলে একে বেকে,
পথ আর হাট গাছ সারি সারি
ছবি থেকে চলে ছবিতে আবার... ('খোলা পথ')

'খোলা পথ', 'চিল : গেয়ে : কবি', 'জামতলা', এ-সব কবিতা 'কবিতা'র পাঠকদের মনে পড়বে—গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় যত কবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে 'জামতলা' অন্ততম স্মরণীয়। জামতলায় কাড়িঘে দূর থেকে নিজের বাড়ির দিকে তাকানো—

কেমন খেলনা বাড়িটা গোর
বপদগ করে আনলোপোর
নান্দু বীচার ডেউচলায়

তারই মধ্যে অনতিক্রম্য দৈনন্দিন জীবন—

কুতোয় আবার সৈঁধিঘে বেরিয়ে
সময়ের গাট অনেক পেরিয়ে
কের মশারিতে ঘবনিকাপাত
চোখে জল দিয়ে আবার এঁতাত ।
বাইরে এখানে আবছায়ায়
ঘটে না কিছুই সারা ছপুর ।
এ শুধু সময়বহার হয় ।
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায় ।

এই সুন্দর ছবিটিতে লেখক নিজের চরিত্র প্রমাণ করেছেন ; আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর সম্পূর্ণতর কাব্যগ্রন্থ পোড়নতর আকারে দেখতে পাবো ।
'ঘোড়া' কথাটার 'ঘোঁড়া' বানান দেখে মর্ষাহত হয়েছি ।

বু.ব.

পূর্ণ কুন্ত: রানী চন্দ। বিশ্বভারতী, ৪।

শ্রীমতী রানী চন্দ্র ক্রমশই আমাদের অধিকৃত ক'রে দিচ্ছেন। রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের আড়ালে-আড়ালে গভী মন-বারো বছর আত্মগোপন ক'রে এসেছেন তিনি, বিদ্যাংগু কথকতার সুযোগ্য নিপিকারিত্বীকপেই 'তাঁকে আমরা প্রথম জেনেছিলাম। কিন্তু তা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে নিখর কিছু দেবারও আছে, তা তিনি প্রথম প্রকাশ করলেন 'জেনানা ফাটক' লিখে। বাংলা ভাষায় কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে-সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে—উপেন্দ্র-হারীশ্চন্দ্রের 'নিবাসিতের আত্মকথা' আর 'দীপান্তরের কথা'তে যার গৌরবময় সূত্রপাত—'জেনানা ফাটক' সেই সাহিত্যধারার একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। শ্রীমতী চন্দ্র প্রধান গুণ তাঁর ভাষার সাবলীলতা—ঠিক মুখে বলা কথার মতোই লেখেন তিনি, হয়তো তার একটা কারণ এই যে মুখের কথা ভাগজে তুলেই তিনি হাত পাঁকিয়েছেন। তাঁর নতুন এবং বৃহত্তর বই 'পূর্ণ কুন্ত'ও এই গুণ বর্তমান। ভাষার পৃষ্ঠা গের্গে-গের্গে, ধারাবাহিকতা রক্ষা-ক'রে, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বহুনির্কে সমোচ্ছল ক'রে তুলে তিনি এই গ্রন্থে প্রাকৃত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আটপোরে ঘুরোয়া ভাষা তরতর ক'রে ব'য়ে চলেছে, কিন্তু বর্ণনায় অবসাদ নেই, তার উপর—অত্যন্ত সুখের কথা—শ্রীমতী চন্দ্র ছু-চোখ দিয়ে কোতুক কুড়োতেও জানেন। সব মিলিয়ে যা পাওয়া যায় তা একটি পরিচ্ছন্ন মেয়েলি আবহাওয়ার স্বাদ, একটি অক্ষুণ্ণিতপ্রবণ সংবেদনশীল মনের স্পর্শ। 'পূর্ণ কুন্ত' প'ড়েই আমার সিকান্ত আরো গভীর হ'লো যে ভাষারি-ধাঁচের রচনাকে সৃষ্টির পর্যায়ে তুলতে হ'লে সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা ভাষার সারল্য। (ফরানি দার্শনিকদের প্রসঙ্গ এখানে না-ই বা তুললাম।)

'পূর্ণ কুন্ত' মোটামুটি হরিষার বৃন্দাবন কানী হবোদেশ ইত্যাদি কয়েকটি আরগায় তীর্থভ্রমণের কাহিনী। ভ্রমণের প্রাসঙ্গিকতাই প্রধান স্থান পেয়েছে, কিন্তু বইটির মূল স্বর ভক্তিবাদে সম্পৃক্ত। যারা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাঁরা এতে খুশি হবার মতো প্রচুর উপাদান পাবেন; পৌরাণিক—বিশেষত বৈষ্ণব—অনেক উপাখ্যান সারা বইতে ছড়িয়ে আছে। তবে আমরা যারা ভক্তির কাছে বুদ্ধির বিসর্জন দিতে পারিনি, এবং দেশের মধ্যে হিন্দুমানির—অন্ধ বিশ্বাসের—সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তুল'কণ ব'লে গণনা করি, আমাদের বিম্বিত না-হ'রে উপায় থাকে না, বধন শ্রীমতী চন্দ্র সত্যীদের স্বতিজ্ঞে কৃতান্তলিপুটে প্রণাম করেন—সেই সব 'সত্যী'রা, যাদের কোনো-এক যুগে পতিদের চিতায় বর্ষভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো। যে-সব প্রোচা

নিষ্ঠাবতীয়া আত্মকাল অপেরা মালা হাতে নিয়ে বাংলা সিনেমায় যাচ্ছেন, এবং ক্লোক-গগলস-ধারিণী অবারোহিণী নান্দিকাসনাথ তীর্থ-হানের দূত দেখে স্বর্গের টিকিট অগ্রিম কেটে রাখছেন, এ-রকম শুক্লিন উচ্ছ্বাস তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, এমনকি অনিবার্য বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু রানী চন্দ্র—যিনি রবীন্দ্রনাথের, শাস্ত্রিনিকেতনের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে আড়িত, তাঁর পক্ষে এই মনোবৃত্তি শুধু অশোভন নয়, আশঙ্কাজনক। কিন্তু, এতৎসঙ্গেও, লেখিকার সার্থকতা এইখানে যে আমাদের মতো মোক্ষলোভরহিত পাঠকরাও বইখানা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠবেন—শুধু তার রচনাগুণেরই ক্ষমতা।

শুধু একটা কথা মনে হর; ত্রিমতী চন্দ্র, আত্মকালকার আরো অনেক লেখকের মতো, বড়ো বেশি রকম বিশেষত্বের আগে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—*inversion*—ক'রে থাকেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই কৌশলটি স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার না করলে তার মূল্য থাকে না, বেশি হ'লেই বৈচিত্র্যের বদলে বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে। কোথাও-কোথাও আতিশয্য দোষও ঘটেছে, প্রকাশের আগে বইখানা একবার পরিমার্জিত হ'লে আরো ভালো হ'তো।

অশোক মিত্র

বৈশাখী

বাসিনী

বুদ্ধদেব বহু সম্পাদিত

দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০ ২১

তৃতীয় খণ্ড, ৩৫১ ২১

চতুর্থ খণ্ড, ১৩৫২ ১১

পঞ্চম খণ্ড, ১৩৫৩ ১১০

এই বিভিন্ন সংখ্যার লেখক ও নিরীক্ষক
কণো আছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বাম-
লেখক বহু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুবীন্দ্রনাথ দত্ত,
নীহারজেন দাস, অন্নদাচরণ দাস, অমিয়
চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,
অতিথি বহু, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব বহু,
বাসিনী দাস, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ
বিশী, এবং আরো অনেকে।

চার খণ্ড একসঙ্গে ৬

নতুন বস্ত্র ক বিতীতবনে প্রাপ্য

THE WISDOM OF AN ANCIENT
SAGE RENDERED BY
A MODERN MASTER

CONFUCIUS

*The Unwobbling Pivot & The
Great Digest, translated with
notes & commentary by*

EZRA POUND

*Handsome Indian Edition : Rs.2/8/-
Published for*

KAVITABHAVAN

by

ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue, Calcutta 13

Nicol Road, Ballard Estate, Bombay

36A, Mount Road, Madras

Also available at Kavita Bhavan

পূর্বাবশা'-র কবিতার বই

অমিত দত্তের

পুনর্গণনা

দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নীল আকাশ

দেড় টাকা

অজয়কুমার ভট্টাচার্যের

সৈনিক

দেড় টাকা

সোপাল ভৌমিকের

স্বাক্ষর

এক টাকা

সম্রাট ভট্টাচার্যের

নতুন দিন

আট আনা

যৌবনোত্তর

আট আনা

অশ্রম ও শ্রম

এক টাকা

সংকলিতা

দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী

দেড় টাকা

ভিনডন আধুনিক কবি

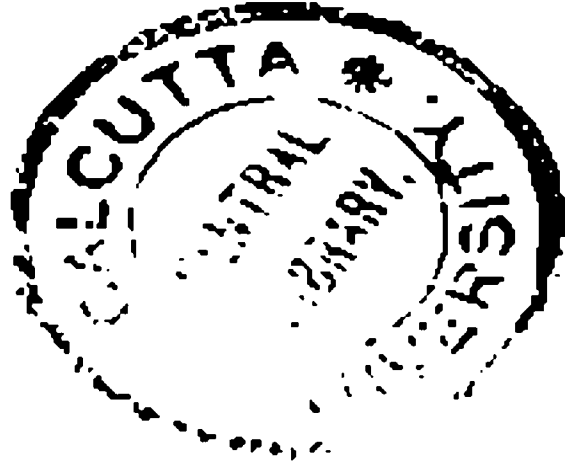
(বাংলা কবিতার আলোচনা)

নয় আনা

প্রকাশক

পূর্বাবশা লিমিটেড

নি ১৩, গণেশ চন্দ্র এ ডি নিউ, কলকাতা



কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৩

চতুর্দশপদী

(নব্বৈনের দুঃস্বপ্ন ও ভাগ্য)

অমির চক্রবর্তী

ক্লাস্ট আপিস-ফের্তা নরেন :

জুতো খুলে কী আরাম (যদিও নরগ
চামড়া বশ-মানা) বর্মে আঁটা ছোটো পদ
এবার পেন্স রে ছাড়া সারাদিনে কম
দাগী নয় সস্তা টুপি, তবু সে আপদ

ছুঁড়ে ফেলি গাথা থেকে । লম্বমান দেহে
ভাবি এ জীবনদণ্ড যার অপার স্নেহে
প্রাণের শান্তির কথা তিনি কি নশ্বর
ছড়ি ছাতা বাড়ি ঘড়ি হিসাব পস্তর

ইউ-এন্-এর কেরানিছ, কোরীয় অনলে
চাপা দিয়ে ভুলে নিজে ব্রহ্মহে থাকেন ?
আয়ু চেয়ে পরমাযু খোঁজে শ্রীনরেন
যতই অযোগ্য হই, বলি চক্ষুজলে

কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

এরা কেউ আমি নই, এরা রবাহূত,
রক্ষা করো, ফিরে নাও দেহ জামা জুতো ॥

(কোথায় স্বস্তি—
স্বপ্ন প্রাণে নরেন্দ্রের নিদ্রা)

স্বপ্নে হাইড্রকর্কের ফ্যাটে ভৌতিক অকৃত্যনয়
আত্মাশ্রম উবাচ

সাইরেনে শুনতে চাও ? যাতে নিরাকার
হাইড্রোজেন বোমা প'ড়ে কোটি ঘাড় থেকে
মুহুর্তে আগব হয় মানবের ভার

ভ্রমার পাইলট মূর্তি সমুচ্চ দয়ায়
মর্ত্যে গানে হিরোসিমা, পালাই প্রত্যেক ?
কোরীয় জীবমুক্তি ?

(দ্বাদশ অধ্যায়
গীতা প'ড়ে দেখ) জাতি-দেহের সংসার
দুর্বল প্রত্যংশ তবু সবই গিয়ে ঠেকে
বিকট ইউ-এন্ দেহে অস্তিম অশ্রায়

প্রাণরঙ্গ ভঙ্গ দেয়া, আরো চরাচর
রণে হানা মারণাজ (কৃষ্ণবাক্য ভূয়ো
যেখানে বোমারু তিনি)

দিব্যান্তকে ছুঁয়ো
সত্য রচা কুরুক্ষেত্রে, বাধা শক্তি-ভিৎ
উদ্ভিষ্ট !—লক্ষ জাগা নরেন্দ্রের জিৎ ॥

একাকার গদ্য হাতে
দুরীত নকল ব্রহ্ম (বিশ্বকৰ্ম)

ছাতা আমি, ছড়ি আমি, টুপি জুতো আমি,
তোমার হৃৎস্পন্দ আমি, সুখ-অহিকেন,
(ব্রহ্ম আমি মদ্বাতীত কোথা কী বা হয়)

শুভবুদ্ধি অলসে তোর তারো স্মৃতি আমি,
পলতে পিদিম তেল । সংসার, নরেন,
আমার অলস্তু দংষ্ট্রা, দক্ষ ক'রে ভয়

অত্যন্ত মনমুগ্ধ-জ্বলে আবির্ভূত আমি ।
আনুষ্ঠানিক আমি প্রতিপক্ষে লড়ি
(রাষ্ট্রমনিবের পদে দিই গড়াগড়ি)

মুক্তি চাও, নাসিকাগ্রে বন্ধ ক'রে মন
অতি সূক্ষ্ম লিফটে নামো, হোক উন্নয়ন
(পলায়নী দলে ঢুকলে তারো ছুতো আমি)

সব পন্থা সম মূল্য জেনে ধরো ট্রেন,
নিরপেক্ষ সমাধিহে নেব ক্রান্ত আমি ॥

আধুনিক বিরোচনের প্রবেশ
(আত্মরী উপনিষৎ)

আমি বিরোচন, নব্য । শুনো না আশান-
বৈরাগ্য-মানা একাক্ষ হৃত-ভারতীয়
পৌরোহিত্য ।

কবিতা।

বৈশাখ ১৩৪২



সময়ে নতুন নেক-টাই
পরেছি, গন্ধের পালিশ চূলে। স্বকীয়
মুখশ্রী দেখেছি জলপাত্রে, মূল্যবান
অমর মহিমা সর্বোৎকৃষ্ট : কোনোটাঠ
বাদ নেই রূপে যশে ; (বৃদ্ধ প্রজ্ঞাপতি
মনে হল অলংকৃত শোভা দেখে অতি
তুষ্ট ।)

ব্যাঙ্কে টাকা ; তৃপ্ত আমি ইহলোক-
পরলোক করি।

ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য জেনে
একমাত্র কান্য, হে নরেন, স্বার্থ মেনে
পরমার্থ ;

প্রতিদম্বী হেনে বীতশোক
কলের মন্দিরে ঢোকো।

মনে যেন থাকে
মোক্ষের চরম স্বর্গ চ'ড়ে ক্যাডিলাকে ॥

ঠাণ্ডা ঘুকে রক্তবর্ণ হাতুড়ি হাতে
প্রতিপক্ষ :

সর্বভাই হে নরেন্দ্র,
আমি কোটি কোটি
কুবের-শিবির-ভাঙা কালের করোটি
আনরা সর্বান্তি শাস্তিবাদী,

কবিতা।

বৈশাখ ১৩৫২

সর্বজয়ী

ছিন্ন মূণ্ড শাস্ত্র করি বহুলক্ষ,

ত্রয়ী

উপাস্ত্র, তাঁদের নামে : হিসাব কষেছি
ত্রৈতাযুগে ফলবে সিদ্ধি সাম্যের সংসারে
ধ্বংসে সেরা হলে আচ্ছ, যদি একেবারে
নিশ্চিহ্ন করতে পারি রক্তবীজ ; গেছি
সেই খোঁজে যেখানেই অত্যাচারী হানে,
হত্যাচারীকে হানি ধনে মানে প্রাণে
লালে লাল ।

মহাপ্রাণে এনেছি লগন

প্রলয়ের স্ট ম-রোলারের ; ততক্ষণ
রোগ মারতে রুগী মারি, নই মাথা হেঁট,
শাদা পায়রা তারি সঙ্গে উচু বেয়োনেট ॥

ম্যালার্জি ঘড়ি বাজিয়ে
আত্মারামের পুনরাবির্ভাব

জাগো হে নরেন্দ্র, তুমি শুনলে পুণ্যবান
কুদে ভারতীয় কথা অনৃতসমান ;
অনন্ত ভারত ভনে অশ্রু মুক্তিবানী,
ঘুম ছেড়ে দেখ সেই প্রাণ, যাতে প্রাণী ;
আপিসে যাবার আগে । কফি না-খেয়েই
জেনো একাকার বিশ্বে পূর্ণ মূল্য নেই
নিজালু সৃষ্টিতে ছাড়া ; নেই লুক চোখে ;
অথবা দাবাগ্রি ক্রোধে রক্তিম আলোকে ।

বাঁচা শুধু এক নয়, দুই, একই বেলা,
প্রাণ খেলে ফুটবল, আত্মা দেখে খেলা,
গোলে হরিবোল এরি মর্ম বোঝো আরো
প্রত্যেকের যোগে খেলা (নিয়মে বিহারো) ।

বাস্-এ যেতে ভেবো এক, ভিন্নতার মিলে—
শূন্যে এক নয় : নয়, সংহারী নিখিলে ॥

সাদে সাতটার ঢং ঢং খণ্টা
(ক্ষুভ শয্যাভ্যাগী নরেন্দ্র
আপিসের জুড়ে প্রস্তুত
এবং ধাবমান)

ভাগ্যে আছি বেঁচে । আমি হঠ না যে-কেহ
রণরঙ্গ কেরানিহে নতুন উত্তেজ্ঞে
পুরোনো জুতোটা প'রে—পৈতৃক এ দেহ—
(নমো ভগ্নভূমি !) নামি বিজাতীয় সেজে ।

মানহাটানের পথে জলন্ত রোদ্দুরে
ঠাটি, দেখি সারি-সারি পণ্য মাংস মদ
তুপ-করা দৈত্যপূর্বে—মনে আসে ঘুরে
দূর থেকে কোন হাওয়া যেখানে সম্পদ
কেনার জিনিষে নয় ;

একান্তে মগজে
জাগে দৈব মাতৃভাষা, তাতে মন মজে ।

তাই হোক, জলজ্যান্ত যতক্ষণ বাঁচি
শারীর-পৃথিবীভ্যাগী একাকারী রোজা
আত্মধর্মে ঠেলি তাকে ।

কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

দেহ নয় বোঝা,
কোরিয়া বাঁচাতে আক্ষেপ তুমি আমি আছি ॥

উপসংহার

দেশের উদ্দেশে :

(বাস-এ অমিত্রিত্ব নবোন্মেষ
বগভোক্তি)

সংসারে কঠিন দাহ, ধন্য কাত্যায়নী !
যত্ন-যত্নে ক্ষুদ্র-কুঁড়ে যা পাও তা দিয়ে
উপবাসী গান্ধীকে বাঁচাতে আগ্নেয়

মথার্থ অমৃত আনন্দ, অহো, অরণ্যের
সন্ধানে ছুটে যে বলে, মর্ত্যের কল্যাণী
উপকরণবস্তু ! (যজ্ঞজ্ঞান নিয়ে

যাও বৃদ্ধ, বনে যাও, গুরুত্ব ভাঙে
ভাকুর প্রসাদে পুষ্ট ।)

নবরাষ্ট্র র'চে

ধান্যকে ফলাবো আমরা, পশ্চিম অগ্রভ
যে-বিজ্ঞান, শিখব তাই : দৈন্য যাতে খোঁচ
দেশে-দেশে, প্রাণতন্ত্রে বিছাতে ইন্দ্রপাতে
সাম্যের বিধানে যেন অসংঘাতী দলে
কোটি সংঘ গড়তে পারি ।

দিয়ে পদতলে

প্রবাসী ছেলেকে ঠাই, নমি প্রণিপাতে ॥

জগদীশ, কামদাস

—**ନିଚିନ ବଚ୍ଚର ଏୟମକେ**

নো কমাথ অটোচার্জ

प्रथम उद्देश्य **कनित प्रमाणवन्नी**

যেতে যেতে বার-বার

निर्घण अलक-दात्रे कर

দেখেছি আমার নাম লেখা—সেই নামে

ଜୀବନ ଉନ୍ନାଦକ ଏମାନ, ଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନେ ଜାଗାନ୍ତେ ଜାଗାନ୍ତେ :

আধার দানবটার

গলা টিপে ভোর আসে—রক্তে তার

आकाशं चन्दनं वायुं नौनिघाय ।

ভেঙে-পড়া মুহূর্তের ছিন্নভিন্ন সংকীর্ণ সঙ্কয়,
অচিন্ত্য কসকল কোনো, কোনো এক বিড়ম্বিত লয়,
পুতিগন্ধে ভরপুর আবর্জনা মাছির গুঞ্জে,
অশান-শকুনি-দৃষ্ট ভীতি শব বিভ্রান্ত নয়নে,
কোন বন্দী-যান,

পথে পথে মিছিলের বুক-কাটা উদ্ধত স্লোগান—
কোনো এক সূর্যাস্তের সুরভিত সুবর্ণরেখায়
হবে তারা শেষ জ্যোতি তরি প্রতীক্ষায়

কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

অগম গহ্বরে মুখ বৃক্ষে আছে রক্তমুখী নীলা—
ভাসমান শিলা ।

লাল ফুল, নীল ফুল, করবী মঞ্জরী—
নিবিড় মিলন লগ্নে ক্লিয় এক রোমশ গ্রহরী
খোলে দ্বার—অক্ষকার অভ্যাস্ত খাদ,
আদিম প্রাণের স্বাদ ।
আমার তোমার সেটে বহুর সংগীত
মদনকৃত যুড়া-বাণে গগন-চুম্বিত
চুড়া ছোঁয়
পাওয়া আর না-পাওয়ায়, হারানোয় ।
গেন সেটে আবেগের পরে
মর্মস্পন্দ বেদনা-অক্ষরে
করে কোন শিল্পী তার লেখনী-সংকেত—
লাল ফুল, নীল ফুল, জাগে এক সবুজের ক্ষেত ।

যেমন ডিমের থেকে বেরোয় শাবক, যে-শাবক
নিরুপায় কালচক্রে আঁঠালো নির্লোম তার স্বক
অজ্ঞানস্রোত উর্বর ক'রে হবে একদিন
সম্পূর্ণ আলবাত্রিস—আমিও বিরামহীন
তেমনি অশ্রুগমন ক'রে যাব আমার নিয়তি—
তারপর, অস্বীকার ক'রে এই কাপুরুষ রতি
লগ্ন বৃক্ষে পদাঘাত হেনে যাব প্রাকারের গায়
চরম সন্ধ্যায় ।

দ্বিতীয় ভরণ : আলস্য-লগ্নে উপবিষ্টা নারীর জবানবন্দী

আশপাশ চেয়ে মনে হয়
যেন এই বেবাক সময়,
হৃদয়ের এত সাধ, অলিগলি বাসনার
লুকোচুরি খেলা, তীরে জড়ো করা মৃত্তিকার
বহু প্রহসন, সঙ আর জাফরান
আকাশ কখনো, বাসি মল্লিকার ব্লান ফুলদান—
সকলে স্তম্ভিত যেন, যেন কোনো একটা কিছু
প্রতীক্ষা, একটা কিছু করাল নিষ্ঠুর
কিংবা চরম মধুর, যেটা ঘটলেই
বিপুল বিরাট অন্ধকার মুহূর্ত মাত্রের
পাক খেয়ে-খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ আলোয় মেথলায়
বাপ্ত হবে চেতনার বেদনায় বেদনায়।
প্রবল প্রচণ্ড তাপে কার
অনাদি কালের যত গর্বোদ্ধত মেরুর পাহাড়
বলীকরণের গুণে
হয়তো ফোটারে বুল আসন্ন কাস্তানে।

ব'লে আছি—ইচ্ছাচেষ্টারের দুটি
হাতল পরম নির্বিকারে যেন করেছে অকুটি
বাঁচবার সকল সাধনা—
প্রকৃতির সবখানে যার ওঠা নাশা, গোপন যন্ত্রণা
স্বতঃস্ফূর্ত সংযমের তীরে ;
—কোথায় আরতি হয় আধার-মন্দিরে !

এল না সে—তার সেই না-আসার
রূপ ধ'রে বিকশিত যৌবন আমার ।
তার সেই না আসায় আকাশে আকাশে
দিনশেষে জাগে রাত তারা-ভরা তিমির-নিশ্বাসে—
ব্যথার অগণ্য পিলসুক্ষে জ্বলে হ'ল দীপাবিভা।

কোথাকার আলোক-বকিতা ।

এল না সে—তার সেই না-আসার
রূপ ধ'রে সময়ে আমার
স্তনের কোরকে দুধ জাগে আর পাতালের তলে
অন্ধকার খনির তরলে
অপূর্ব প্রত্যয়ে সতী
হই পুষ্পবতী ।

• • •

স্তনু নিখাদে কৃষ্ণকলিটিরে আগামী সূখের নানে
পাঠিয়ে দিয়ে রাত স্বপ্ন-জাগরণে জাগছে ভোর-জাগা প্রাণে ।
আতুর চোখে তার ব্যর্থ কামনার
উথল-পাথলের গঙ্গা নাচে—
পায় না জানি তীর, তবুও তরঙ্গীর
তিমিরে তীর্থের বেদনা আছে ।

তৃতীয় তরঙ্গ পার্কের খেলিঙের জ্বানঘন্টী
যে-শিশুর সারা রাত নিদ্রা নেই,
দুঃস্বপ্নের দৈত্যদল যাকে বার বার
এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্তে সর্বনাশে
তাড়িয়ে গিয়েছে নিয়ে দুর্নিবার আকর্ষণে

সুধার আশ্বাসে সারা রাত
 কোল দেবে, খেলা দেবে,
 অনেক অনেক চুমু দেবে ব'লে—
 তারপর, ছোট ছোট হাত
 পরম নির্ভরে যেই সে বাড়ায়,
 কোথায় তাসের ঘর টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ে
 খিলখিল হেসে অট্টহাস আহাম্মক পাখাগটী
 ভীমাকার কদাকৃতি মুখখানা তুলে
 দাড়ির অরণ্য-চুলে
 রকমারি কত ধাঁজে আঙুল ঘুরিয়ে
 হাত বুলোয় পাশেই দোলনায়
 পুতুলটা কেন বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোয় !

যে-শিশুর সারা রাত নিদ্রা নেই,
 ভোরে তার ঘুম পায়।
 ভোরে যার ঘুম পায়
 তার মতো হতভাগ্য কখনো দেখিনি—
 চড়ুই পাখিরা বলে।

কেন ঐ শিশুর কথা আজকে সকালে
 ঘুরে ফিরে মনে পড়ে—
 জানি না আমারো চোখে কেন ঘুম, শুধু ঘুম,
 এই ভোরে সারা দেহ ঘুমেই জড়ায় !
 ছুঁঁমির শয়তান কাজিল পাখির জাত
 ইচ্ছে ক'রে লেজগুলো উচু-উচু ক'রে

টোটকা পুরীষে তার
 আমার সকল গাত্র
 উত্তপ্ত বিহ্বল তিক্ত ক'রে তোলে।
 তবু এই ভোর, এই ভোরের হাওয়ায়
 সূর্যের শপথ নিয়ে রক্তিম আকাশে
 আমি ভালো আছি।
 কবে যেন মনে পড়ে একটি সন্ধ্যায়
 আমারি নির্জন কোণে ছুটি শিশু,
 ভাই-বোন নয়,
 লুকিয়ে-লুকিয়ে এসে
 পরস্পর চুমু খেয়ে
 হঠাৎ পালিয়েছিল।

* • *

বলতে পারি হাজার কথা,
 বলার তা তো নয়—
 সোঁহ হই, কঠোরই হই,
 হায় গো মহাশয়,
 আমারো আছে ভূমি
 জলায় মজা যুগল-দলে
 মানস বন-ভূমি।
 আর যা হই, কিছু না হই,
 কথাটি কব না—
 কিছুতে তবু, কিছুতে আর
 যুদ্ধবাজ মৈনিকের ব্যারাক হব না।

চতুর্থ ভরণ শাস্ত্র অরণ্যের অবানবন্দী

যে-কেউ যা-কিছু হোক,
অরূপ বিরূপ হোক,
অপরূপ আপনার অবুঝে
পথ হ'তে পথ পার
চলেছে অমৃত-দ্বার
পাতা-ঝরা চেতনার সবুজে ।
কত বড় বেদনায়
সবুজ সবুজ হয়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি---
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী !

নাচে পাখি লেজ-ঝোলা,
রাতের তারার মেলা,
চেনা হয় অচেনার সঙ্গে—
কাটে দিন এমনি তরঙ্গে ।

কত বড় বেদনায়
অচেনা সে চেনা হয়,
সে-কথা আমিই শুধু জানি—
তোমায় বলব না,
তোমায় শোনাব না,
শুনতে চেয়ো না তুমি রানী !

নহু দূর দূর হ'তে
 অকুল অবাধ স্রোতে
 ছোট্টে নদী মিলন-মরণে—
 অঙ্কায় মহিমায়
 তীর তার গান গায়
 হৃদয়ের কুন্ত-ভরণে ।
 কত বড় বেদনায়
 মূর ওঠে মোহনায়,
 সে-কথা আনিষ্টে শুধু জানি—
 তোমায় বলব না,
 তোমায় শোনাব না,
 শুনতে চেয়ে না তুমি রানী !

বড়ো শীত খুখুরে
 কুঁড়ে হ'য়ে খুঁড়ে করে,
 সঞ্চয় ক'রে যায় আগামী আগুন—
 যদি তার কোনো খেই
 আজ কোনোখানে নেই,
 অজাত শিশুর তবু ত'রে ওঠে ভূণ ।
 কত বড় বেদনায়
 জীবন জলতে চায়,
 সে-কথা আমিই শুধু জানি—
 তোমায় বলব না,
 তোমায় শোনাব না,
 শুনতে চেয়ে না তুমি রানী !

দুটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

যাত্রী

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হ'য়ে গেলে র'য়ে যায় চারি দিক ঘিরে এই দেশ :
নদী মাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রাঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে ।

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিল কারে
মানুষ সার্থক নয়—তবুও সার্থকতর হবে
মনে হত কাজ ক'রে কথা ব'লে গ্রন্থ মিলিয়ে,
মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে গিয়ে ।

সময় নিঃসৃত তবু সব চেয়ে গভীর বিপ্লবী
কুরিয়ে ফেলেছে সেট দিন রাত্রি সেরা সত্য-উদঘাটন সব
সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির
ক'রে ফেলে অশ্রু নব কলসবরে গড়েছে শরীর ।

বাহিরে ভিতরে সীন হয়ে থাকে মন,
শাস্ত্র—আরো শাস্ত্র হয় অস্তুঃকরণ
পুরোনো দিনের স্তম্ভ দু চারটে পশ্চিমের আধারের কাছে ;
নব সূর্যে সম্মেলন—যাত্রা যাত্রা যাত্রা যাত্রা আছে ।

হৃদয়, তুমি

হৃদয়, তুমি সেই নারীকে ভালোবাস, তাই
আকাশের ঐ অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে

প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে
তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবাসে ।
বাসুক ;—তবু সবের চেয়ে আলোর কথা এই
আমি তাকে সময়পরিক্রমার পথে আবছায়াতে দেখে
নিজের মূল্য রাখে গেছে ব'লেই ভালোবাসি ।
শরীর ঘেঁষে ভালোবাসে তবু তো অনেক ।

কাজ অকাজের ঠাসবুনোনির কাকের থেকে আমি
দেখছি আশায় দেখেছে যেন বিকেলবেলার ছলে
থম্কে ভাসা মেঘের মত নীলাকাশের পথে
থমে আছে ; —অথবা থমে চলে
জানি না মেঘ : ভালোবাসে অথবা কুতূহলে
জানি না নারীসূর্য আশায় আলোকিত ক'রে
নিজের অন্তরকক্ষ নেমে সূর্যপ্রক্রিয়ায়
চ'লে গেছে কাদের ভিতরে ।

যে যার নিজের বিহিত কাজে । সকলি ঠিক—এই রকম ভাবে
সারাটি দিন আমার হৃদয় ব্যাপ্ত ক'রে রাখে ।
স্বতই আমি যে গাল তিল যে হাত ভালোবাসি
রাত্রি হ'লে সে হাত—সেই সুদূর হাত এখনো আমাকে
জানি না বিশ্বশৃঙ্খলাকে আঘাত ক'রে ভালোবাসে কি না ;
সীমা সময় প্রকৃতি তাতে চূর্ণ হয়ে যেত ;
সকলি তবু স্থির রয়েছে ;—এই স্থিরতা তবু
তোমার আমার অজান্তে সব শিক্তরও অভিপ্রোভ ।

আলোচনা

বিক্রম দে

(১)

চোখে স্বকৃৎসকে সূর্যের স্থিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পার্শ্বের পারে ।
হৃদয়ে কি তার আরাগলের শ্রোতে সোরাব্ উচ্ছীষিত ?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাস্তুনী যেন মর্মে মর্মে তারা কী আকুল করে !
কে তার কণ্ঠে দিল এই বিশ্বয় ?
ধরা দেশে এই মরাদেশে সে কি করবে বিশ্বস্ত ?

হৃদয় তার পাশে বসে সেও যেন জীবনের অভিযান,
কতো উৎসাহে চড়াই কতো না প্রাস্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন আবণের
ধৈর্থে মাঠে ফের উড়ে' আসে আশ্বিন
মাঘের অস্তে বারে বারে কেন অন্ধুর
কেন যে লেনিন আগুন জাগান্ লেনিনপ্রাণের তুঘারে ।

(২)

চামেলি মিলেছে একটি যাকুয়ে
সান্ধ্যের প্রসাদে তার নৈরাশ্যের নত্ন বিষাদ

କବିତା

ଚୈତ୍ର ୧୩୫୨

ଯେନ ଧୂପେ ଧୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରୂପ କର୍ମର ମତେ କର୍ମେ
ପ୍ରାତାହିକେଇ ନିଜେକେ ପେରେଛେ ବିଲିୟେ ବାରନ୍ଧାର ।

କଥା ବଳେ ଯେନ ଆନ-ଜାୟେ ପାତା ଝରେ
ଯେନ ବା ପାହାଡ଼େ ନଦୀର ବାଲିତେ ଝିରିଝିରି ମୋନା ଝଲେ
ନୀରବତା ତାର ବାଗାନେ ଶିଶିର
ଗାଛେ ଗାଛେ ଜାଗେ ବଢ଼େନ ।

ଚାହନିତେ ତାର ଯାତ୍ରାରତ୍ନ, ନତୁନ ଦାମେର ପଥ
ହୁଏ ଦିକେ ଚାଲେ ଝଞ୍ଜୁ ଓ ଶୁଠାନ୍ ଡାଳ,
ବାନ୍ଧେ ମାନ୍ଧେ ନୂତନ କଥାମାନେ ବା ମନାମାନେ ବଢ଼ିନା
ଏହି ଛାୟା ଏହି ରୋଦ୍ଧେର ଝିକିଝିକି ।

ମେ ଯେନ ପାଶେ ତେନେ ମବାଇ ଭୋଲେ
ଚାଲେ ଯାଏ ଆର ରେଧେ ଯାଏ ଶତ ଟୁକରା
ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନରାତ୍ରେର ମଜାଗ ମତର୍କ ଶତ କାହିନୀ—
ମେ ଯେନ ମାଘେର ରୋଦ୍ଧେ ଛଡ଼ାନେ ଆକାଶ
ସନ୍ଧୁର ସନ୍ଧୁର ବାସ୍ତବ ବର୍ତ୍ତମାନେ
ଆମରାହି ଘୁରି ଅତୀତେ ଅତୀତେ ମେଘେର ଉବିଷ୍ଣୁତେ ।

ছটি কবিতা

ঐশ্বর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

চিহ্ন

তোমার মাংসল দেহ,
এই মাটি, এই বন, এই মানুষের পথ ছেড়ে
আমার মনের ছায়া অশ্রু কোনখানে খোঁজে পথ।
তোমাকে ছাড়িয়ে আমি আরো দেখি, শুনি,
আরো কত মূর্তি গড়ি আপনার মনে।

তোমার মাংসল দেহ
এই পৃথিবীর মত ছ'দিনেই, হায়, মিথো হ'ল।

তুমি কি দেখো নি, জানো নি—
আমার মনের পটে কত ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে,
জীবনের নিত্য স্পর্শে মোছে তা কখনো,
তোমার রূপের তুলি রং মাখে তবু।

আকাশ সাগর মাটি ছাড়িয়ে এবার
ছ'জনে উধাও হব অশ্রু কোনোখানে।
তোমার আমার পায়ে
এ মাটির যে-রঙিন চিহ্ন আঁকা হ'ল,
মুছে না তা—
এ মাটির ঘর ছেড়ে স্বপ্ন-বাসর
গড়ব যখন শূণ্য ধ্যানলোকে।

এই বসন্তে

আমার জীবনে কাল্পনের আশ্রয় প্রথম সন্ধ্যা এসেছে—
এসো, আমার পানপাত্রখানা তুলে ধরো,—তুলে ধরো !
জানলার নীল শাসি ডিঙিয়ে
ঝিরঝিরে হাওয়া কাঁপিয়ে তুলছে
শোবার ঘরের ফুলদানিটাকে
রং-করা যত আসবাবে তার লাগছে কাঁপন ।

ঘূর্ণী ঝড়ের উল্কাষের ঢেউগুলো
উদ্বেল ক'রে তোলে আমার নুক, আর
দেয়াল-ঘড়ির চলমান কাঁটাকে,
অমরাবতীর গহন কুঞ্জ থেকে
গোলাপের মৃদু গুঞ্জন এনে মূছে দিয়ে গেছে বৈরাগ্যের অভিমান,
এসো, আমার পানপাত্রখানা তুলে ধরো, তুলে ধরো !

কবিতা
—
বৈশাখ ১৩৪২

ছটি কবিতা

সুনীলচন্দ্র সরকার

কবি ও বন্ধু

বন্ধু

মনে মনে কাছাকাছি হ'য়ে
পরস্পর-ডাক জাগরুক,
জীবনের গুচ্ছ বেঁধে চলা
পৃথিবীর এই এক সুখ
দেওয়া-নেওয়া লোকব্যবহারে
আমরা জীবন্ত করি দিন,
যথাসাধ্য দিই এ উহারে
তুমি কেন থাকো দানহীন ?

কবি

হৃদয়ের চিকন রেশমে
জুড়ে কাক আলাদা ভাগ্যের
মস্তব্য ঝিকিয়ে মনে-মনে
কিছুক্ষণ কাটে তোমাদের ;
এ-এ দান তোমো একতানে
অশ্রুস্রব দৈনিকের স্রব,
উজ্জল-কুয়াশা-সমাধানে
ঢাকা দাও ঘুম-সমুদ্র র।

আমি কিন্তু জপি অশ্রুমনে
দেব যা তা পাবার উপায়

কবিতা
১৯৫২

ভ্রমে বসে ঐশ্বর্যের কমা
যদি নামে : ক্রান্ততারা খমা
পাঠায় আমার মধ্যে দিয়ে
তোমাদের অসম্ভাব্যতায় ।
সম্মত ক'রে অচিরস্থায় মার
দিতে চাই শ্রীতি-উপহার ।

পিঙ্গিম

সামান্য পিঙ্গিম, তারো আলো ঠিকরে যায়,
ভিঙিয়ে পাঁচিল ওঠে মন্দির-খিলানে,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আভা গাছের আঁড়নায়
মেঘেও চমকায় গিয়ে—হয়তো—কে জানে ।
তারপর ? ফাঁক পেলে, এমন সে নয়
পিছোনে কাঁপ না দিয়ে নীলপলাশুড়ে,
অস্পষ্টে কুৎপিণ্ডে পার হবে দিগন্তয়,
কেন সে থাকবে লোগে কেবলি পিঙ্গিমুড়ে ?

আমরা ছড়াই শুধু ছায়ার হেঁয়ালি,
কিংবা ধোঁয়াতে থাকি কুসুম্বিতে ঢাক.
জানি না আলিয়ে লক্ষ জীবন-দেয়ালি
পৃথিবী কী-কথা বলে অনাস্থুর মুখে ।

অচেনা মায়ের স্তম্ভ অসীমের হিম :
আমরা মানি না মানি, জানে তা পিঙ্গিম ।

অপরাহ্নের নদী

মনোমোহন রায়

উষর মাঠের ধূসরে বিলীন প্রায়
শীর্ণ সোঁতায় অপরাহ্নের নদী
বিকেলের রাঙা রোদ লেগে চিকচিক
হারানো দিনের এ কার সোনার হার !

জ্বল কই ? এ-তো স্বচ্ছ মুকুরে ঢাকা
হলুদ বালির স্বপ্নিল তলদেশ
স্নানাবসানের সিক্ত শাড়ির ফাঁকে
অতীত লোভন তোমার তরুণ তনু ।

তোমাকে যে এত ভালো লাগে, ভালোবাসি
কারণ, তোমাতে আমার আমাকে পাঠ—
চিরপরিচিত বৃদ্ধবৃদ্ধ হয়ে ভাসে
তোমাতে বিলীন আমার বিশ্বরূপ ।

বিকেল মিলায় । স্নান হয়ে এল দিন ।
রাত্রির নীল তিমির-তটিনী তলে
ডুব দিয়ে আমি কোথা যাই—ডুবে যাই—
ঈশ্বর, যেন আবার ভেসে না উঠি !

যা-কিছু বাসনা ছিল এ-মনের কোণে
এই এতটুকু তৃণাঙ্কুরের মতো,
মিটিয়ে নিয়েছি তির্যাস । তৃণ । প্রভু,
এবার শাস্তি, অগাধ শাস্তি দাও ।

চৌমা কবিতা

অনুবাদ : দিলীপ দত্ত

মনে হয় একটা ফুল
কিন্তু ফুল নয়,
মনে হয় কুয়াশা
কিন্তু কুয়াশা নয় সে ।
যাধরাতে তার দেখা পাই,
আর ভোরের দিকে উধাও হয় সে,
বসন্তরাতেও ঋণস্থায়ী স্বপ্নের মতো
তার আসার ধরন,
আর তার চ'লে যাওয়া
সকাল বেলায় মেঘের মতো
কোথাও তাকে পাবে না খুঁজে ।

(গো-চ-ই ৭৭৭—৮৪৬)

নতুন বউ, হৃৎকথার কথা জানে না সে,
বসন্তের দিনে
আয়নার সামনে দাড়িয়ে বাঁধছে চুল
হঠাৎ জানলা দিয়ে চোখে পড়ল
গাছের কুঁড়ি থেকে ফুটল ফুল,
স্বামীকে সে পাঠিয়েছে ঘুমে
তার কথাও পড়ল মনে ।

(নি ঘা—অবয়ব দত্ত)

কবিতা

চৈত্র ১৩৪৯

শান-বাঁধানো কুয়োয়
পড়ল রঙিন মেঘের ছায়া
বসন্তে পীচফুল রঙিন হল
কে জানে, ঐ ভঙ্গুর পাথরের তলায়
হয়ত রয়েছে পরির দেশের পথ ।

(চিত্রেন চি—সব্ব শতক)

অতীতের কথা ভেবে চোখে জল আসে
বর্তমানকে দূর করা কত কঠিন ।
উঠানে ঘরের বারান্দায়
শরতের হাওয়া এসে
খেলা ক'রে যায়,
পুকুরের বাঁধানো সিঁড়িতে
লতানো গাছ জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছে :
রোজ্জকার মতো দরজাটা খোলাই আছে সারাদিন—
কই, কেউ ত এস না ঘরে ?

(লি ওয়াইউ ১৩৬—১৩৮).

কবিতা
চৈত্র ১৩৫২

চতুরামণী

সত্তর অষ্টাচার্ঘ

কলহাস্তরিতা।

মোহনার মোহে মৌতাতে
ছিলাম কণ্ঠা-কুমারী
নদীর হৃদয় নয়
জানতাম খুলী হও তেতে
সমুদ্রে ছিল তোমারি
পৃথিবী হিরণ্ময় ।

কলহাস্তরিতা,
হলে প্রলয়ান্ত্র হতা
মধুচ্ছন্দা, তাইত
সমুদ্রে আমি শায়িত
তীরে-তীরে চির উর্ধ-নীর !
তুমি কোন দূর স্বরধুনীর
স্বরে অস্তহিতা !

বিখ্যাত

জানি জানি আজ নেই সাধনা মনে
আকুল নয়ন বলে পথ-বাতায়নে
এহর পুড়ছে এখর হৃপূর বেলা ।

কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

কচি দেবদারু-চিকে ঝিকিমিকি মিখা

বিকেলের মরৌচিক।

এনেছে চিকন হাওয়া

ভামার পাভায় অশথের সাথে মনের মিতালি পাওয়া ॥

সবই ছবি এট চাওয়া হাওয়া যাওয়া-আসা

কথা নয় শুধু ভালোবাসা মিছে ভাষা

সজ্জাও হবে তেয়ি বক্ষা—খেলা ॥

স্মরণ

মনে-রাখা বুঝি মনের উপর স্বর্ণ-রেখা শুধু

বালুচর আর রোদের হৃপ্পুর সোনায়ে রূপায় ধু-ধু!

হায় নদী-মেয়ে কতোটুকু দিলে দাগ

কতোখানি ছিল ফাস্তুন-খনি কতো রাঙা ছিল ফাগ

কতো বা অতল হৃদয়ের তলে কস্তুর অমুরাগ

—সব রেখে গেলে আমার নিকষে, ও কেমনতর প্রেম?

অস্তুরে থাকে কার কতোটুকু হেম?

শুধুই পেলেম কটু বিষ, শ্রীতি স্মৃতি-ভস্মের খালা

চৈত্র-চাঁদের আঙনে কেবলি কথার আবলী ঢালা!

জানি কুহকিনী তুমি মনে রাখো মনে মনে বাঁধো সেতু

অয়ি লাবণ্যে আমি অরণ্যে চিরব্যাধ কালকেতু ॥

কবিতা।
চৈত্র ১৩৫২

পিকুস্তল।

খোঁপায় দিতে কটকি রূপোর ফুল
কতো না ক্ষপা গুনেছি সেই তারা
আজকে ক্ষাপা হাওয়ায় সমাকুল
চুপিচুপি তোমার চুলের ধারা।

আজকে হঠাৎ ঝরঝরিয়ে পড়ে
ক্ষয়ে-যাওয়া স্মৃতির মতো নীল
অপরাজিতার তরী ধরে ধরে
তোমার চুলের আকাশ অনাবিল।

আমার মনে-পড়ায় তারা আসে
আসে ভালোবাসার ক্ষত-মুখ
চৈত্র-রাঙা সারা কুসুম-মাসে
এসি তোমার মৌসুমী কোতুক ॥

•

অস্বপ্নে

মরেশ্বর

কত কিছু দৈবে ঘটে ধরণীর পদপ্রান্তে এসে ।
বাউল নদীর স্রোত পাড়ি-ধসা হৃৎস্পন্দনের শেষে
আশার সমুদ্রে মেশে । জনতার মেলা
ধাবমান গ্রহের ডঙ্কা শোনে । ভেঙে গেলে খেলা
সোনার বিকেল পড়ে বসন্তের পাতায় পল্লবে
সব হবে—মন বলে—আবার আবার সব হবে ।

জ্বলন্ত ট্রেন হৃদয়ের শ্বাস ফেলে স্টেশনে দাঁড়ায়,
জানালায় হাত নেড়ে যারা যায় তারা শুধু যায় ?
পিছু ফিরে ভাকায় না, যদি চোখ ঘোর হয়ে আসে !
দিনাস্ত ফেরায় রঙ বীরভূমের আকাশে আকাশে ।

কত কিছু দৈবে ঘটে ! খোলা মাঠ, ছনে-ছাওয়া বাড়ি,
রেল-লাইনের পাশে চীনে-চিত্র শিল্পের সারি,
ডোবায় পল্লীর ছায়া, আসন্নতিমিরে চেয়ে থাকা
জ্যোতিষ্কের আলোচোখ চৈতন্যে নিমেষে পড়ে আঁকা ।

আবার আসব ফিরে—পৃথিবীতে কত দৈব ঘটে—
সমুদ্র-মেখলা বাঙ্গা পর্বতে-প্রান্তরে-সমতটে
দূরে দূরান্তরে, মাগো, ঘরে ঘরে । কত ভালোবাসো !

কবিতা
চৈত্র ১৩৫২

বুক ভেঙে যায়
আনন্দে বিধাদে বেদনায় ।
কী-মন্ত্র শেখায়, দেখো, আন্মোলিত শালবীথি, বলে : আশা রাখো
জীবনের যত অসম্ভবে ।

সব হবে—মন বলে—আবার আবার সব হবে ।

শান্তিনিকেতন,
নাহিতাবেনার
১৩৫৯

চিত্রলেখা



অশোকবিজয় রাহা

১০

জানে এ ছোটো চৌট ছটি
পৃথিবী প্রকাণ্ড এক সূর্য-সেঁকা রুটি
সারাদিন চলে তাই খুঁটে-খুঁটে খাওয়া.
কঁকে-কঁকে ঘাড় তুলে চাওয়া
গায়ে মাখা হাওয়া
এর কাছে এর কাছে যাওয়া
কিছুক্ষণ তারস্বরে গাওয়া ।

এই শুধু চলে দিন ভর
তারপর
সন্ধ্যা হলে চুপি-চুপি কিরে যাওয়া ঘর
ডালের উপর
খড়ের বাসায় ঢুকে শুয়ে নিঃশ্বাস
বাড় শুঁজে ঘুম ।

১১

গাছের সারির পিছে চুপি-চুপি কখন এখানে
এসেছে শবরী উষা, দাঁড়ায়েছে বনের আড়ালে,
পরেছে বিশাল খোঁপা, মজুকোটা রক্তজবা কানে,
বুকের কাঁচুলিখানি বিঁধে আছে মহয়ার ডালে ।

কবিতা
মে ১৩৫৯

১২

হিন্নমস্তা পৃথিবীকে দেখি
এখানে মাঠের একধারে
রক্তাক্ত চৌকারে
পৃথিবীর আত্মহত্যা এ কি ?

চারদিকে ধসা-মাঠ, কাকরের স্তূপ
কালের বিদ্রূপ
তারি এক পাশে
শেষ-সূর্য একবার জলে গুঠে পশ্চিম-আকাশে ।

ভীর-বেঁধা রক্তস্রব্যা অস্ত্র এলোচুলে
খ'সে পড়ে দিগন্তের মূলে ।

১৩

দিন শেষে এইখানে
পৃথিবীর মৃত্যুর অশানে
খোয়াই আমাকে রোজ টানে ।

মনে হয় সারাদিন দাঁড় বেয়ে চলেছি উজানে
সেই ভোর থেকে
তুই ভীরে দেখে-দেখে
কত ঘাসে-ঢাকা জমি, কত ঝাউঝাড়
উচু-নিচু পাড়
কত পথঘাট
ধান-ভরা মাঠ

১৬৯

সারি-সারি ঘরবাড়ি
কত-যে বিচিত্র নরনারী ।

ভারপর
দিনশেষে ক'মে আসে জোয়ারের জোর
প'ড়ে যায় হাওয়া
ধেমে যায় বাওয়া
আবার ভাটার টানে
ফিরে আসি রোজ এইখানে ।

১৪

এই সকালের বুকে একটি সোনার তার বাঁধা
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সাধা ।
দিনের আলোর সাথে বীণার মতন
বেজে ওঠে শাস্তিনিকেতন
চারদিকে তার
জেগে ওঠে গাছপালা, পাখির ঝংকার
পথে-পথে কাঁপে সেই সুর
বিচিত্র মধুর ।

চমকায় সোনালি রোদ্দুর
ডালে-ডালে কচিপাতা হাসে
অজ্ঞাপতি খেলা করে ঘাসে
মুখে-চুলে আলো মেখে ছুটে আসে ছেলেমেয়েদল
পুলক-চঞ্চল ।

কবিতা
চৈত্র ১৩৫২

ত্রিবিম্বায়

অরুণকুমার সরকার

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে !
প্রেম জাগে হৃদয়ে, প্রেম জাগে প্রাণে
প্রেম জাগে ভ্রাতার হৃদয়ে আমার ।

ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্লনা উধাও,
উজ্জল রোদ্রের সঙ্গে হেমন্তপুণে,
কার স্বপ্ন বীজধাতু হ'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘূমে দূর থেকে দূরে !

সোনালি ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কল্লুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মল্লয়াবনে মাটির পুতুল ।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন ।
এই আলো, আলোমলো আল্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিমিত দৈবী অপচয় ।

আনন্দ আনন্দ করে আমার কপণ
হৃদয়ে আনন্দ করে, মধু করে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোক
দূর আর দূর নয়,—আত্মীয়, স্বজন ॥

TWO POEMS

ARVID SEUTENBERGER

[আর্ভিড স্যুটেনবার্গ একজন বিশিষ্ট তরুণ দার্কিম কবি, টি. এস. এলিঅট, এজরা পান্ডোরের প্রভাব অতিক্রম ক'রে কাব্যে একটি নূতন দ্বারায় প্রবেশ করেছেন।

WESTERN CEMETERY

All things drift in the wind permanently blowing ;
The graveyard, dating from a time when wagons
And wagon roads determined the dead's travel,
Lingers a decade, barbed wire proceeding
Unevenly from one gray post to another
Stones, crosses, pointing variously skywards
Barely top the grass now so long growing
That every weed is gone from grave and fence-row.
All is clean prairie but the stone memorials
Weathering, as vague as the tepee rock rings
Of Sioux Indians marking the hills to southward.
Here slow time and grass charm to indifference
Even the normal concern for a personal identity
Anonymous grass, waving in far-off vistas,
Barely wavers here in the wind's caresses—
Each blade erratically in pure irrelevance
To graves or stones, or the dead past or future.
Here is no record of the dead's arrival
Or any reason for their sons' departure,
But grassland where no memory keeps a foot-hold,
Pure, featureless, and at last unconquerable.

পশ্চিমী সমাধিক্ষেত্র

নিত্য বহমান হাওয়া তাতে সমস্ত ভেসে চলেছে ।
এই সমাধিক্ষেত্র, প্রথম ওয়াগন্-গাড়ির সময় থেকে
—পূর্বে সেই গাড়িতে মৃতের যাত্রা নির্ধারিত হত—
বছর দশেক ধরে একই ভাবে রইল, ধূসর কাঠের খুঁটি থেকে
আরেক খুঁটি পর্যন্ত লোহার কাঁটা-অলা তারের দীর্ঘতর ব্যাধি ।
পাথর, ক্রুশ-চিহ্ন উল্লসিকাশে বিচিত্র অঙ্গুলি-নির্দেশ ;
সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সমান উচু ঘাস বহুকাল গজিয়ে উঠে
কবর আর বেড়ার ধার থেকে সব আগাছা বিলুপ্ত করেছে ।
সমস্তটা পরিচ্ছন্ন প্রেয়ারি মাঠ, কেবল এই স্মারগিক প্রস্তরসারি
অম্পষ্ট, যেমন ঐ আদিম-অধিবাসী সিউ-ইণ্ডিয়ানদের তোলা

টেপি পাথর-চক্র

দক্ষিণদিকে পাহাড়ের সীমা-আকানোর ।
এখানে বিলম্বিত সময় আর ঘাস অস্তিত্বের ভাবনাকেও
ভুলিয়ে দিয়েছে অন্তমনস্কতায় :
অনামী ঘাস দূর দূর দৃশ্যস্তরে আন্দোলিত,
হাওয়ার আলিঙ্গনে এখানে শুধু ঈষৎ কম্পমান—
প্রত্যেক ধরধর ঘাসের ফলকে ত্র্যাম্যমাণ বিস্তৃত অসংগতি,
কবর বা পাথর, মৃত অতীত অথবা ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনো যোগ নেই ।
এখানে কোনো হিসাব রাখা নেই মৃতের আগমনের,
অথবা তার ছেলের চলে-যাওয়ার কোনো হেতু :
শুধু ঘাসের জমি এই, যেখানে স্মৃতির পা-রাখবার জায়গা নেই,
বিস্তৃত, পরিচয়হীন, এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয় ॥

অনুবাদ : অমির সেনগুপ্ত

কবিডা
চৈত্র ১৩৫৯

CHORES

The sparrows in the hay-roofed shed were warm
And lousy through the coldest day of winter.
Since I was neither warm nor lousy, I
Watched them with mixed regard, seeing the steam
Of my breath and the cows' turn cold and thin
And disappear in three feet in the air
That hung half quiet there inside the shed.
Gray day, gray shed, gray sparrows in the hay,
Mixture of cold, discomfort, animal warmth
And work to do, the scene recurs to me
So clearly, so without significance
I think it has some universal sense
Of high, low, cold, warm, privilege and duty,
The old abstractions and their origins.
Though I have seldom wished to be a sparrow,
Whose generations still survive the cold
And lice of many winters, I could wish
Some wind of abstract time would take me back
To time where present loveliness and cold
Were all, and this in future retrospect
Were sparrows in the shed in pure experience.

কয়েকটা উকুনে চড়ুইপাখি উত্তাপের আরাম পেয়েছিলো
 আমাদের খোড়োচালের গোয়াল ঘরটায়
 শীতের সবচেয়ে ঠাণ্ডা সেই দিনটিতে,
 কিন্তু আমার যেহেতু শীত করছিলো, উকুনও ছিলো না মাথায়,
 আমি একটু সন্দেহের চোখে দেখছিলাম ওদের,
 আর দেখছিলাম
 আমার আর গোরু ক-টার নিশ্বাস কেমন রোগা, ঠাণ্ডা হ'য়ে
 মিলিয়ে যাচ্ছে তিন ফুট উচুতে হাওয়ায়,
 গোয়ালঘরের ঝুলে-থাকা ঝিমিয়ে-পড়া হাওয়ায়।
 ধূসর দিন, ধূসর গোয়াল, খড়ের গাদায় ধূসর চড়ুইগুলো,
 ঠাণ্ডা, অস্বস্তি, জ্বালন্ত তাপ, আর হাতের কাঁক,
 এই সব মিলে-মিশে দৃশ্যটি ফিরে আসছে আমার মনে
 এত স্পষ্ট হ'য়ে, এমন ইঙ্গিতহীন
 যে আমার মনে হচ্ছে কোনো বিশ্বব্যাপী অর্থ বৃষ্টি আছে ওর,
 উচু, নিচু, ঠাণ্ডা, গরম, কৌলীক, কর্তব্য,
 এই সব পুরোনো ধারণার উৎসে যেন ফিরে যাই।
 কখনো চড়ুইপাখি হ'তে চাইনি আমি,
 যার বংশাবলী ঠাণ্ডা আর অনেক শীতের উকুন পেরিয়ে টিকে থাকবে—
 তবু আজ প্রায় যেন মনে হচ্ছে
 কোনো গাণিতিক কালের হাওয়া আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাক
 সেই সময়ে, যেখানে বর্তমানের শীত আর সাবণ্যই সর্বশ্ব,
 আর ভবিষ্যতের স্মৃতিলিপিতে এই আজকের দিন
 হ'য়ে গেছে গোয়ালঘরে চড়ুইপাখির বিস্তৃত অভিজ্ঞতা।

সবুজ জমির ফালি

চিন্তা অষ্টাচার্য

সবুজ জমির ফালি
এক বুক ঘাস নিয়ে পড়ে আছে খালি ।
ভীকু পায়ে চুপে চুপে নিয়ে আস্ত মন
কখন এসেছি বসে জানি না কখন ।
হাজারো ব্যর্থতা আর ভরাডুবি শেষে
এসেছি হঠাৎ এই দেশে—
এলায়ে দিয়েছি তবু ঘাসের উপর
নরম নরম ঘাস ফেনার আস্তুর ।
উদগত মুখে তার নিয়ে শুভ্র হাসি
—পান্নার জৌলুষ রাশি—
কচি কচি দুর্বা ঘাসে অজস্র কোতুক,
বসিয়সী বরিত্রীর হাসি মুখ ।
দুরন্ত প্রাণের ছন্দে লীলায়িত গান
অবিরাম ঢেউ হয়ে বহে যায় আনন্দের বান ।
গাং-ফড়িং, ডেঁয়ে, ঐ কাঁচপোকা, কীট,
ঝিঁঝিঁর ঝিঁঝিট
শব্দ রূপ বর্ণের আহার ।
ক্লাস্তি নেই আর ।
হাস্তা হল দেহ মন ঘাসের মতন
জানি না কখন ।

Sestina-র রানীকে স্মরণ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আজকে সকালে ফের ফিরে এলো তোমার রঙিন দিন, রানী
বনে বনে মাঠে মাঠে যুজ্জিত পদচিহ্ন ধূলির আঁধারে
আকাশের সোনা ঝরে মাটির ধূসরে আর হাওয়ায় ছায়ায়
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় চিঠির কোমল পাঠ মিঠে নামে ডাকা
অপলক চেয়ে থাকা দিঘির কাজল জলে ; চোখের কাজলে
অবলিগু হ'লো সখি, মধুবর্ণ ও-কপোল তোমার মুখের ।

২

প্রাণের পুকুরে ছায়া—মনের মুকুরে ছবি তোমার মুখের
ছনোছনো কান্না কতো জনমের জীবনের মরণের রানী ।
দিবালোক স্নান তাই হ'লো বৃষ্টি মুছে-যাওয়া তোমার কাজলে
সে কার বুকের তাপ জলে আজো বলয়িত বহির আঁধারে
অস্তর-দেহলী খুলে উড়-উড় করে কতো ভুলে-ভুলে ডাকা
ছটফটে ছোটো-ছোটো নাম জলে সোনারোদে মিশায় ছায়ায় !

৩

ছোটো ছোটো কথা ফেরে লীলা-চপলতা নিয়ে আলোয় ছায়ায়
তাদের বুকেই যেন কিছুটা আদল আছে তোমার মুখের
ছেড়ে দিয়ে খোঁজা কেন ? চকিতে হারিয়ে কেন ফিরে-ফিরে ডাকা ?
যেই ডাকে সাড়া দিয়ে বুকের বেতারে তুমি সুর তোলা রানী
সেই সুর বহুদূরে গিয়ে ফোটে নিশীথের তারার আঁধারে
কিসের কুহক নিয়ে সেই সুর জমে গিয়ে রাতের কাজলে ?

৪

কবে যে গলায় কঁাস লেগে গেছে বেণী-বাঁধা কবরী কাজলে
কতো কথা বলাবলি সারা হ'য়ে গেছে সপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়

অঙ্গীকার আছে লেখা পুত রক্তে স্পন্দমান আধুত আখরে
কবিতার মতো হ'য়ে ছড়ানো রয়েছে আভা সেই সে-মুখের
আজ্ঞা মন-প্রাণময় তারই আভা ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, রানী
অবিরাম উঠে আসে সেইখান থেকে মিঠে ছোটো-ছোটো ডাকা।

৫

মহাশূণ্য ভ'রে ওঠে পাখার কাপনে সেই ঝিরিঝিরি ডাকা
ঝাঁক-ঝাঁক উড়ে যায় মাঠময় বনময় মেঘের কাজলে
অণু-অণু কথা দিয়ে স্মৃতির শহর গ'ড়ে তারি মাঝে, রানী
ব'সে থাকে বিদেহিনী মানসের নিকুঞ্জের নিভৃত ছায়ায়
দিন করো নশ্র যুহু, রাত করো মধুস্রাবী মায়ায় মুখের
বিমোহন মাধ্বীক ক্ষরে অনুরাগ স্বরগের আখরে-আখরে।

৬

ভালোবাসা ভাষা পেলো আজ একি বাতাসের গুঞ্জিত আখরে
যামিনী জাগর ভ'রে একটি নরম নাম বারে বারে ডাকা
সে ডাকার শেষ নেই, শেষ নেই যে-লীলার তোমার মুখের
রূপায়িত যতো তার চিত্রিত প্রাণ-পটে কল্পিত কাজলে।
কাজে আজ মন নেই ; বসি এসো নির্জনে তোমার ছায়ায়
মনে মনে কথা হোক হৃত সেই সন্তোগ ফিরে দাও, রানী।

৭

ফিরায়ো না এ সকাল তোমার রঙিন দিন ? বেদনা কাজলে
ক'রে দিও নাকো গ্লান ; বসি এসো বর্ষিল বনের ছায়ায়
মনে মনে কথা হোক হৃত সেই সন্তোগ ফিরে পাই, রানী।

যশাতি

শ্রীমদ্রামানন্দ

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ বনবাস প্রাচ্য প্রাক্তদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মপহারক । আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত ; জাতিভেদে বিবিধ মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা । কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচরঘেরা প্রাসাদেও
উল্লিখিত যেহেতু, তাই ভয় সেতু নদীতে নদীতে,
নর নগরে নগরে । পঙ্কাস্তরে অতিবেল কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে ; দ্বেষ
পুষ্ট চীন থেকে পেরু ; প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর
মানা ; নৈশ হানা, আত্মঘাতী অঙ্গীকার, বিচারের
সম্মত বিকার বা স্বস্থ ধিকার এড়িয়ে যে যায়
ভাগ্যগুণে, চোখে চোখে রাখে তাকে অদৃশ্য শকুনে
প্রবাসেও অহরহ ; যথাকালে অমৃতের দায়
সাক্ষ সন্তুতিকে স'পে, অস্তিম শয্যায় নিকামত
পারে না আশ্রয় নিতে ; উষর ধূলিতে নিম্পিষ্ট সে ;
ইতিহাসনিষ্কাস্তও বটে । অর্থাৎ কৃতান্ত আত্ম
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং, প্রৌড়ের কেন, সকলেরই
কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধ্য লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ ।

অবশ্য আমার

পক্ষে সঙ্গত যে নয় অনুভূত, সে-কথা স্বীকার
করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিল্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশযাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যসম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ। তাছাড়া স্বকীয়
সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে।
অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য একদা বাচে
যারা জিতেছিল, অস্তিত্ব তাদের অনন্ত সম্বল
ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল
নিতান্ত নিরুপলব্ধ। তরল অনলে পরিণত
ঝলঝল ছল ; গলিত অস্থরতল ; অনুগত
দিগ্ধর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায় ; মেঘে
অস্থিত চূড়া, পদান্ত উর্মির মুখর উদ্বেগে
প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সময়ের জের
শ্রিত বিদেশিনীর অভয়ে ; এবং সোনার তরী
তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিদ্বান্স অমুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিল তারা ॥

ভেলা

আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ

এটুকুই আমার পরম পরিচয় । আমাকেও
 সন্ধ্যাবেলায় নিষাদের উষণ উল্লাস উদাসীন
 নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মান্নাদের
 গুণটানা থেকে । গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার,
 রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী
 ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল
 চুকে ; এবং হঠাৎ অধোগতি অমুকুল স্রোতে
 হয়েছিল অব্যাহতি । অসুরোক্ত বিদীর্ণ বিদ্যতে ;
 অমি ; ভঙ্গ ; জলন্তু ; সমুখ প্রত্যক্ষ কপোতের
 পক্ষবিধূনন ; সমস্ত সবিতা বেগুনী শোণিতে
 লুপ্ত রহস্যের বীভৎস প্রতীক ফুটন্ত জলার
 জালে জর্জরিত তিমি ; শেষনাগ শিখিলকুণ্ডলী,
 মৎস্যের উপজীব্য ; অপ্রমেয় নির্বাতমণ্ডলে
 বিক্ষম সঙ্গিল ; উল্লসিত বরুণের বিপরীত
 রতি—সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি
 ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার
 পরে ; এবং এখন স্বভাবের অনুমোদনেই
 আমার অনন্ত স্বপ্ন প্রাচীন প্রাকারে সুরক্ষিত
 জনপদ, স্নিগ্ধ, সান্ত্ব সন্ধ্যায় যেখানে থির শিশু
 ভদ্র তরলী-সহ মুকুরিত নিকষ গোম্পাদে ॥

কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
 পায়নি স্বয়ং রংগাবো, সার্বজনীন রসের নিপান
 মৃগতৃষ্ণানিবারণে অসমর্থ ব'লে সে যদিও

ছুটেছিল জনশূন্য পূর্ব আফ্রিকায়, পরকীয়
সাম্রাজ্যবাদের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যেন (সাকী আর
কবিতা সেখানে যেমন অভাবনীয়, মদিরার
অপর্যাপ্তি তেমনই দারুণ) । আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্কোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অতিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে ।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভবিষ্যের
নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মাধ্য দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি বা না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ । এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পন্থের মতো
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধোঁও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলক্ষির অভাব লুকিয়ে রাখে ;
এবং অলৌক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হালুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত ॥

উপরন্তু, দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে ;
অজ্ঞাত পুরুষ সংগ্রহ ব্যতিহার্য নয় ছবিপাক ।

অর্থাৎ প্রকট ব'লে সজ্জাগের অনন্ত বঞ্চনা,
 পক্ষাণে পা না দিতেই, অস্বার্থ্যমী নৈমিষ নির্বাক
 এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আঙ্গু উদ্ভাবনা
 পরিপূর্ণ মহাশূন্য ভস্মীকৃত জ্যোতিষ্কের প্রেতে,
 প্রাক্তন অভ্যাসদোষে ভুলে যায় মৌনের মন্ত্রণা
 উদ্ভীত অমর কাব্য কাগজের সুকুমার স্বেতে ;
 কিন্তু চিত্তবিক্ষেপেও অভিব্যাপ্ত বহুল সংসার
 যেখানে আসক্তি, ঘৃণা ভিন্ন শুধু প্রার্থী সংকেতে,
 এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
 যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি
 ক্রোপাতে পারে না আর । চরাচরে নেতির বিস্তার
 নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি
 অস্তুত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
 জ্ঞাতিশ্বর অভিমুখ্য ; তবু স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি—
 মেনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসৌমের ব্যুহ,
 স্বপ্নে, জাগরণে যেন মনে রাখি নয় কল্পতরু
 উর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীকুহ,
 যাকে কেন্দ্র ক'রে ছোট্টে দিগ্বিদিকে সমুদ্র—না মরু ?

ছটি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘুঘু

ছপূরে ডাকে ঘুঘু
হলুদ গাছটাতে ।
রোদেও যেন শীত
এমনি মন তার ।
ছপূরে ডাকে ঘুঘু—
বুকের কাছটাতে
ভয়ের মত চুপ
হৃদয় যেন কার ?
তাকেই ডাকে ঘুঘু
তাকেই বারেবার ।

পাহাড়ে ডাকে ঘুঘু,
কবরে একপাশে
ক্ষণেক ব'সে থেকে
ওড়ে সে নীলাকাশে ।
আবার ক্ষণে-ক্ষণে
কী যেন হয় মনে—
নীতের মরা ঠেলে
কথার ঢেউ আসে ।

কবিতা

১৫৩ ১৩৫২

তখন ডাকে ঘুঘু
গুটিয়ে পাকা তার ।
শ্রুতির ভাঙে হিম,
তবু তো হাহাকার ।

থাক, কৃষ্ণচূড়া

থাক, কৃষ্ণচূড়া !

অবাক করার মতো তেমন বসন আর পৃথিবীতে নেই ।
যাকে নিয়ে মন হবে সোনা
সে আবার কেঁদেও পাবে না ।

সময় বিবর্ণ, চ'লে যায়,
রাঙা যদি রাঙবে লজ্জায় !

কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু

এককালে কলকাতা ছিলো আমার চোখে অপকৃপ, আন্তর্য সুন্দর,
অপ্নের উন্মেষের মতো, কল্পনার বৃক্ষে ফোটা ফুল ;
তার ধূলোয়, তার হাওয়ায়, তার উত্তপ্ত ধাতব নিশ্বাসে
চৌক্য ক'রে উঠেছে আমার বাসনা ।

সফ্রায় চৌরঙ্গির আলো, ছপ্পরের অ্যাগফন্ট-সৌরভ,
ফুটপাথে অদ্ভুত জনতার কেনিস বিশাল পরিশ্রোত,
আর হাজার শাদা ছাদের উপর নীল মেঘের নেমে আসা
আমাকে পাগল ক'রে দিতো, আনন্দে ।

যখন অম্ম নেত্র ঘোবন, নৌকোর পাল কুলে ওঠে,
আর দূরে, মোনালি কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
তোমনি তুমি ছিলে আমার কাছে—অম্পট, উজ্জল, অচিস্তনীদ্র,
তুমি, কলকাতা ।

অতিথি হ'বে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে,
কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নাটিকা, আমার ভীকৃত্য ডাঙিয়ে
ঈপ্সিষে পড়লে আমার উপর, যেমন চোখের সামনে হঠাৎ ধুলে যায়
অকুরন্ত সমুদ্র ।

যনে পড়ে সেই সব মুহূর্ত, যখন ঘুম-ভাঙা গস্তীর প্র্যাটকর্ম
স'রে যেতো ঘোমটার মতো, আর ঘণ্টা বেজে উঠতো আমার বৃকে ।
—তুমি, আবার তুমি ! তোমার ভীক, প্রবল, পরিচর্যী ভোর,
ভিস্তির অলে সন্তান্যাত ।

কবিতা
চৈত্র ১৩৫২

নিখাসে পান করেছি তোমাকে, স্পর্শ করেছি রোমকূপে,
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার উপর, যেমন বর্ষা প্রথম সমতলে,
আর ট্যান্ডির স্পন্দিত বেগে আমার আশ্রয় উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে
ভবিষ্যতের হাওয়া ।

‘তুমি আমার’—এ-কথা কেউ বলতে পারবে না তোমাকে,
তুমি, মায়াবিনী, বাণিজ্যের বিশ্বভাগিনী দুহিতা ;—
কিন্তু আমি তো পেয়েছিলাম আমার মুক্তি, যখন তোমার হাওয়ার কানে-কানে
বলতে পেরেছিলাম, ‘আমি তোমার’ !

মুক্তি !—তা-ই তো আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে, পেয়েছিলাম,
বাচার বেগ, ব্যস্ত হবার স্বাধীনতা ;—যে-মুক্তি তীর পেয়ে নদীর,
স্বপ্ন পেয়ে কবির, আর বসন্তের আনন্দের দিনে
একটি ক্ষণজীবী পতঙ্গের ।

কোনো কথা তুমি দাওনি আমাকে, শুধু ডাক দিয়েছিলে,
আমারও কোনো যৌতুক ছিলো না, উৎসুক অনিশ্চয়তা ছাড়া ;
তবু—তাই—তাই তোমার রাস্তার বাক-বাক আমায় চোখের সামনে
খুলে গেলো ভবিতব্যের দুয়ার ।

অদৃষ্ট যার নাম দিয়েছি আমরা, যাকে জানি না, জানতে পারি না,
তাকে আমরাই সৃষ্টি ক'রে চলি—এ-ই তুমি নিশ্বিষেছিলে আমাকে ;
আমার নিষ্পত্তিকে আমার মুঠোর মধ্যে আমি পেয়েছিলাম
তোমার হাত থেকে, নিঃসংশয়ে ।

সহজ হয়নি সেই পাওয়া, যুকে হেঁচকে গেছি বার-বার,
হতাশায় বোবা হ'য়ে গেছে বুক, আর বাস্—এর ঝাঁকুনির তন্ত্রায়
মনে-মনে বলেছি, ‘আর যেন না থাকে, যেন নামতে হয় না কোথাও’—
কখনো কোনো দুঃখের দুপুরে ।

দুঃখ ?—না, না ! তোমার ক্ষম আমি বা ছেড়েছি তা তুমি,
আধেরে তার দাম থাকে না ; আর তার বিনিময়ে তুমি
মানীর মতো দিয়েছো আমাকে—আমার সম্ভার পরন্তে-পরন্তে মিশে আছে
তোমার উপঢৌকন ।

বা-কিছু স্বভাব সোনা হ'য়ে অ'মে থাকে, বা-কিছু অতীতেরে অর্থ দেয়,
বদ্ধতা, প্রেম, সংগ্রাম, প্রথম পরিভ্রমের আনন্দ,
আমার কাজ, আমার বৃত্তি, আমার জীবন—সব, সব আমি পেয়েছি,
তোমাকে পেয়ে, কলকাতা ।

ইচ্ছা যেখানে গভীর, রক্ত যেখানে মুখর, প্রাণ যেখানে ব্যাকুল,
যেখানে ত'রে থাকলে অন্য কোনো বক্তব্য কিছু এসে যায় না,
'বৈচে আছি'—এই চেতনা উৎসারিত হয় যেখান থেকে, সেখানে তুমি আমাকে
পূর্ণ করেছে, কলকাতা ।

তাই তোমার রোহের চাবুক ছিলো সুখ, ডামড়ার দামে ছিলো মদিরা,
তোমার ভিড়ে ছিলো একান্তরূপে আমি হবার আহ্বান,
আমার সব তিক্ততা মুছে গেছে, যখন দেখেছি সভ্যতার আলো জ'লে উঠতে
তোমার সজ্জায়, কলকাতা ।

সব দিয়েও শান্তি দাওনি আমাকে, তাহ'লে কিছুই দেয়া হ'তো না,
কিছু দেখেছো আড়ালে, যাতে আবার আমাকে খুঁজতে হয় ;
আর এমনি ক'রে বার-বার আমি কিরে পেয়েছি তোমাকে
নতুন ক'রে, কলকাতা ।

বেহেতু তুমি যাদের মতো আদর করে না, মোহিনীর মতো জয় করতে বলা,
বেহেতু তুমি আমন্ত্রণে মহান, প্রত্যাখ্যানে নিষ্ঠুর, প্রতিদানে উষ্ম,
তাই তোমাকে ভালোবেসেছি—অমূল্য মহাসুখ
লালসম্বী কলকাতা ।

বার-বার ফিরে পেয়েছি তোমাকে, বার-বার খুঁজে পেয়েছি নিজেকেও ;
বে-আমি আমি হ'তে চাই, হ'তে পারি না, অথচ বার বদলে
অল্প কিছুও হ'তে পারি না কখনো—আমার সেই দুর্বল তুমাকে তুমি
বুলতে দাওনি, বলকাতা ।

কর্মের আলোড়ন, বিশ্বের সংঘাত, স্বপ্নের তীব্রতায়,
তোমার যন্ত্রের সমুদ্রের ছন্দে জাগিয়ে রেখে, জালিয়ে তুলে
আমাকে সার্থক করেছে। তুমি—আমার উজ্জয়িনী, আমার জায়েদিকা
— বলকাতা !

সে আত্ম অনেকদিন চ'লো । চলতে পাতার মতো ঝ'রে পড়লো বছরগুলো,
ইতিহাসের পাতা খ'মে পড়লো, যুগান্তের খোঁজো হারিয়ে,
নতুন সাজে সাজলে তুমি—নুঝি-বা কিছু থাকি ছিলো
আমাদের চেনাশোনার ।

দৃষ্টিতে উড়ে এলো । প্রসাদের ফুলকি এলো ছুটে ।
টান পড়লো তোমার আঁখিতে, দাক্ষণ বান ডাকলো শিরায় ।
ত্রাসে, বিকোপে, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে, আর কঙ্কালের কাণ্ডায় মিশে গেলো
আমার বৌবনের অস্থিম নিবাস ।

মানুষের চিত্তভিন্ন মাংস তোমার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো,
কৃষিভেদে ফৌণ গোড়ানি ট্র্যাফিকের শব্দে ডুবে গেলো,
ব্র্যাক-আউটে ঘন-হাওয়া ঘাস নিমূল হ'য়ে মুছে গেলো
উষাসের অস্থির পানে-পানে ।

মড়কের সংগ্রাম, কদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার,
ভেদ, বিচ্ছেদ, কাকবের মতো তর্ক, দাঁতে-দাঁত-ঘষা মতবাদ—
বাংলার বিদীর্ণ বুকের উপর ফুটে উঠলো, ঝ'রে পড়লো
আমার শেষ গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া ।

কবিতা

চৈত্র ১৩৫২

বা-কিছু ভালোবেসেছি আমরা—চিন্ময় কৌলীশ্বরের সৌরভ,
বদ্ধতা, প্রেম, সৌজন্য, বিকশিত ব্যক্তিত্বরূপ—
সবে একে-একে ভেঙে পড়লো, লুটিয়ে পড়লো তোমার ফুটপাথের পাথরে।
গাছ ম'রে গেলো। পাখি নেই।

সাক্ষী কোথায়?—সেই বখন এরোপেনের আকাশ ভ'রে আতঙ্ক,
তোমার শূন্য ট্রাম-লাইনে দেখেছি অলের মতো চিকচিকে জ্বালা,
না কি হাসপাতালে নিয়ূ'ম রাতে অবিদ্যাম লবির শুয়োরানি—
সেই তোমার প্রাণের আশ্বাসে?

কোথাও না।—হঠাৎ তোমাকে বিদায় বলতে হবে একদিন।
আক্ষেপ করি না তার স্রষ্টা। সব সুখ কে কবে পেয়েছে?
কিন্তু আমি তো পেয়েছিলাম সব সুখ, কোনো-একদিন তোমারই মধ্যে,
সে-কথা ভুলবো না।

তুমি কাউকে মনে রাখো না, তুমি শুধু পায়ে'র লজ,
হুমতা করো না অতীতে'র, তুমি শুধু গতির বেগ—
কিন্তু সেই গতির ছন্দে উতরোল আমার বছরগুলিকে
আমি ভুলবো কেমন ক'রে!

আমার স্বাতি ক্রমবে তোমার ধুলোয়, প্রথম ক'রে ভুলবে তোমার হাওয়া
আমারই মতো অন্ত কোনো অতিথির নতুন নিবাসে;
কিন্তু আমি—অন্ত যে-কোনো আকাশের ডলার, যে-কোনো দূর দিগন্তে চোখ রেখে,
আমি বলবো—কি'রে এসো।

কি'রে এসো, আমার স্বপ্নের বলকাতা—আজো তো এই কথাই বলি,
শুধু আমার নগ, পৃথিবীর চোখে উজ্জল হ'রে ওঠো,
গঙ্গা থেকে বিশ্বের কূলে অব্যবহিত হোক বাণিজ্য
তোমার সম্পদে, চিন্ময়ে।

মাছুষের অমের ফসল মাছুষের অয়ে সঞ্চিত হোক,
অমৃতের তৃষ্ণার দান আনন্দে উন্মোচিত হোক,
তোমার হুলে-ওঠা সজ্জায় ঢেউ তুলে চঞ্চল হোক
স্বন্দরী মহিলাদের হাসি ।

- আরো কত ধ্বংস হবে তোমার, নতুন ক'রে ভগ্ন নেবার ভগ্ন ?
আরো কত যত্না ভেকে আনবে ?—স্বপ্ন তবু অমর ।
সভ্যতা লুপ্ত হবে, ভাবতে পারি না কিছুতেই,
তাই এই ইচ্ছার চীৎকার ।

আর-কোনো শক্তি নেই আমার, কিন্তু ইচ্ছারও শক্তি আছে ;
আমার ইচ্ছার বীজ স্ব'রে পড়ছে তোমার ভবিষ্যতে,
তার উত্তর কোনো দূর কালের ভগ্ন রচনা করছে তুমি—
এটুকুও জানতে দেবে না ?

স্বধার সঙ্গে বন্ধন। করোনি, অস্তিত এইটুকু,
ব্যক্ত করোনি স্বন্দরকে, গুণীর দাওনি নির্বাসন—
আমার বিবাহের তাপ শাস্ত হবে, এটুকু যদি যত্নের আগে শুভেত পাই
কোনো দূর দেশে, কোনোদিন ।

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র। আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। • আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। • চিঠিপত্রে গ্রাহকনম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নথতো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। • অননুমোদিত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যদাযোগ্য স্টাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা থাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিষেধ কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। • সমস্ত চিঠিপত্রাদি

পাঠাবার ঠিকানা :



কবিতাশব্দ

২০২ বাসবিহারী এভিনিউ,

কলকাতা ২২

প্রতিষ্ঠা বস্তু-র গল্প ও উপন্যাস

সুখিত্রার অপমৃত্যু ৪/-

মনোমীনা ২৥১/-

বিচিত্র হৃদয় ২/-

সেতুবন্ধ ২৥

অপরূপা ১/-

প্রকাশক : কবিতাশব্দ

‘কবিতা’র সম্পূর্ণ সেট

একাদশ বর্ষ	৩/-
দ্বাদশ বর্ষ	৪/-
ত্রয়োদশ বর্ষ	৫/-
চতুর্দশ বর্ষ	৬/-
পঞ্চদশ বর্ষ	৭/-
ষোড়শ বর্ষ	৮/-
ষে-কোনো দু-বছর একসঙ্গে ...	৯/-
ষে-কোনো তিন বছর একসঙ্গে	১০/-
ষে-কোনো চার বছর একসঙ্গে	১১/-
ষে-কোনো পাঁচ বছর একসঙ্গে	১২/-
ছয় বছর একসঙ্গে	১৪/-

কবিতা

আবাত ১৩৬০

সপ্তদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৪

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

মনে-মনে

জানি না কী ক'রে কার মমতার মতো
শাস্ত্র-শুভ্র ভোর এসে ধরে,
জানি না কী ক'রে এত নীল হয় রোজ
ঋপদী আকাশ। ঘাসে এত রং, রোদে
জীবনের সাড়া, বিকেন্দ্র হয়ে এত নির্জন ভাষা
- (জানলো না কেউ) তবু কী ক'রে যে বেঁচে আছে তারা !

ভালোলাগা রং নিয়ে
সাধারণ-অপরূপ
কত ছবি আঁকলাম,
নগরে ও বন্দরে
হিতকথা বুকের
শিখলাম, যত নদী
বিকেন্দ্রের, যত পাখি
সন্ধ্যার—জানলাম।

আমার কি সব তবু ঠিক জানা হ'লো ?

,

শিশুর চোখের বিশ্বয়-আঁকা মায়াবী দৃষ্টি যার
প্রসারিত এই জীবনের গাঢ় মানচিত্রের রঙে,
সুদূর গাঁয়ের কুয়োতলা আর শহরের কোনো পার্কের ঘুঘু ঘাস,
পৃথিবীর কতো রহস্যময় সোনালি রূপালি দ্বীপ,
অনেক মহৎ উজ্জ্বল উপকথা
আবরণ খুলে জীবনের মানে এখনো জানায় যাকে
সে কি তবে তার মুখের উপর বন্ধ দরজা দেখে
ফিরে যাবে একা, ভুলে যাবে গান, বলো ?

হারিয়েছি কত বিকেলের মতো নারী,
বহুবার আমি হারিয়ে ফেলেছি
পাখির দেহের রঙে কিলমিল, স্নেহে-ছাওয়া ঘর,
হারাইনি তবু সুরের নূপুর, ভুলিনি আমার গান ।

এখনো তো লুট ক'রে আনে মন দিনের প্রবাল,
রাতের হীরের হার,
এখনো হাজার সহস্র খুশির
নিবিড় বর্না-আলো,
এতটুকু ভালোমাগা
কুড়িয়ে ছড়িয়ে সহস্র ভিড়ে ডুবে যাই, ভেসে উঠি ।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬০

ফুলের মতন তারারা যখন অন্ধকারের স্রোতে
ভাসে, কাঁপে, জ্বলে—মনে পড়ে তার মুখ,
মনে পড়ে তার মুখ।

রাতের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়।

যে আছে দাঁড়িয়ে অতিদূর পাড়ারগায়ে
দীপ হাতে সেই অভাবের সংসারে
সত্যমিথ্যে যদি ফিরে যাই হঠাৎ সেখানে তার
বিবর্ণ খেলাঘরে

সে কি আর ভাঙা পুতুল কুড়োবে
কাক-ডানা রাতে একা ?

হৃৎকনের কত গহন হৃপ্পুর

চ'লে গেছে সেই যোজন-যোজন দূরে।

যদি ফিরে যাউ ভায়তলা আর পারুলভাঙার মাঠে,
যে যাবে সঙ্গে তার কথা কিছু জানি !

তার শয্যার পাশে

শুয়ে আছে একজন নিরিবিলাি ভোরের শয্যায়
শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে,
দেয়ালে আলোর পরী। খোলা দরজা। ঘরে ঠাণ্ডা হাওয়া
খেলা করে, ঝর্না-হাওয়া করে,

ঝরে একমাথা চুলে, ঝরে
করুণ ক্রান্তির ভারে বুজে-থাকা চোখের উপর ।
পাখা নেড়ে, শিস দিয়ে হলদে পাখি উড়ে গেল মেঘে
নির্জন বারান্দা থেকে । সারা ঘরে শাস্তি স্তব্ধতার,
কখনো হঠাৎ তার নিমীলিত শুকনো গলা শুনি
ছায়া-ছায়া-আলো-স্বর—হয়তো ডেকেছে জল দিতে ।

শিরশিরে হাওয়ায় কাঁপে শরীরের মেরুন রূপার ।

চৈতন্যের আলো পড়ে ঘুম-পাওয়া সস্তার পাপড়িতে,
সূর্যের চুমোয় লাল পাণ্ডু গাল । টেবিলের দুটি
তরুণ কমলালেবু চেয়ে আছে দূরের আকাশে,
চিকন সোনালি রুনি ত্রিয়মাণ শব্দশাদা হাতে
যেন বেদনায় স্থির—মনে হ'লো—সেই দুটি হাত
মায়াবী নদীর ভেজা সোনালি বালিতে আছে প'ড়ে ।
ক্রাস্কে হুধ । শিশি । ওড়ি-কলোনের জ্বাণ উন্মীলিত
সারা ঘরে । পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস
কাচের গেলাশে ভরা—গোধূলি-মদির ।

কাল সারারাত ছায়া-অন্ধকারে প্রতি পলে পলে
মোমের শিখার মতো ইচ্ছা তার জ্বলোছিনো এই
ভোরকে পাওয়ার । চোখে ছিল

গাঢ় প্রার্থনার ভাষা, বুকে
উজ্জল আকাঙ্ক্ষা শ্রীত জীবনের, সৌন্দর্যের সাধ ।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৭

কে যেন তারার মতো কাল রাতে ডেকেছিলো তারে
যুক ইশারায় দূরে, তবু সেই একজন জানি
ভোরকেই চেয়েছিলো উন্মথিত রক্তের ভিতর,
যেমন সে পেতে চায় প্রেমিকের চুমোর আদর
রাত্রির জ্বলন্ত লগ্না। ছায়াচ্ছন্ন অপদেবতার
অমর্ত্য চোখের নীচে রাত তার কাটে হরিণের
করোটির ছবি নিয়ে, সারাক্ষণ জেগে থেকে কাল
তুনেছে ধূসর ধ্বনি অবচেতনার অন্ধকারে।

এখন সে শুয়ে আছে ক্লান্তপ্রাণ সম্রাজ্ঞীর মতো
ভোরের আলোয় নেয়ে, ডুবে আছে মস্তক আরামে।
জেগে উঠে হাত নেড়ে, সোনালি রুলির শব্দ ক'রে
গোধূলি-মদির শাস্ত্র বেদানার রস নিলো চেয়ে,
হাসির আশ্চর্য জ্যোৎস্না তার

ঠোট চুঁয়ে ঝ'রে গেল (হায়,
অপদেবতার ক্রোধ) ঝ'রে গেল ভোরের শয়্যায়।
অতল হৃদয় বেয়ে উঠলো গান, শাস্ত্র, শব্দহীন,
চোখে তার উপচে-পড়া অপরূপ জয়ের উল্লাস।
ভোরকেই চেয়েছিলো উন্মথিত রক্তের ভিতর

সেই একজন।

২

ছটি কবিতা

স্বপ্নের পরে

১

সঞ্জয় অষ্টাচার্য

আমার স্বপ্নকে ভুলে যেয়ো ।

কতো ছবি ভুলেছে তো তোমার আকাশ
কতো মাল অপকৃপ কালো রূপো-রং
ভাতে তুমি আলো-নীল হয়েছ বরং
হৃদয়ে শুনি নি দীর্ঘশ্বাস,
ছিল না ছরপনেয়
কোনো স্বপ্ন, কোনো স্মৃতি, কোনো ইতিহাস ।

প্রাণের প্রাণে
ফুরায় না সবটুকু প্রাণ,
ফুল ধরে তবু ফুল ফোটায় বাগান,
দিনের আলোর শেষে নক্ষত্রের রাত্রি তবু থাকে
রাত্রির অনার্ত অবসানে
উষা-প্রভাষার নিত্য ভোরের আবির্ভাব মুখে মাখে ।

আলো দাও, হৃদয়ের খুলে দাও মুখ
তোমার আলোর দান বসন্ত আনুক
অনেক অনেক প্রাণে,
পান করো প্রাণের আসব,
দেবার নেবার আছে যা-কিছু তা সব
দিয়ে নিয়ে জীবনের জেনে যাও মানে ।

তোমাকে দিয়েছি আমি আমার যা দেয়
মৃত্যু থাক শুধুই আমার
আমার মৃত্যুকে ভুলে যেকো ॥

ব্রজাঙ্গন।

[শ্রীকৃষ্ণদেব বসুকে নিবেদিত]

ফুলের মতো উঠত ফুটে আমায় পেলো সিন্ধুতীর
বিস্মাস বৃষ্টি বসন্ত তারে কবি,
অন্ন আভরণের শোভা বিচ্ছিন্ন কোন্ দূতীর
তারেই নিয়ে মাতিস্ আঁকে ছবি ।

বিশ্রমের বর্ণ নেই বর্ণনাই দিচ্ছি তার
ক্রন্দনেতে হাসির মৃৎ ভাঁজ ।
মনের মোনালিসায় আঁকি, সোনালি দাগ সে-চিত্রার
দাভিধির। চৈত্রে পাবে আজ ॥

কোথায় তুমি তেমন মেয়ে বন্ধ কাঁপে, বসন যায়
দেহের ভেলা হেলায় বেয়ে যাও ।
আমার নামে তোমার নামে প্রদোষ উষা-সন্ধ্যা পায়,
আমার তুলি তোমার হাতে নাও ?

তেমন লীলা না-ই বা হ'ল, কমল-লীলা কী দরকার !
পিকাসোরাই সুরুর সুরে ভরা ।
তুলির ব্রজবুলির সুরা চাইনে পুরা-বিদর্ভার
ব্রজাঙ্গনা, দিচ্ছ যদি ধরা ॥

চিত্রলেখ।

অশোকবিজয় রাহা

১৫

বসন্ত-উৎসব শেষ
মিলায়েছে সংগীতের রেশ ;
নীরব এখন
শাস্তিনিকেতন ।

মাঝরাত,
দেহে-মনে মুগ্ধ অবসাদ
ছ'চোখের আগে
শুধু এক পূর্ণ চাঁদ জাগে ।

জ্যোৎস্না আজ ছাপায়েছে আকাশের কূল,
আশ্রয়ীণি ঝরায় মুকুল
অবিশ্রান করে শালফুল
মধুমালতীর গন্ধে চারদিক করেছে আকুল ।

লতাবিতানের গায়ে ধোবা-ধোবা ফুটেছে মাধবী,
ভাস্রাচোখে তাকায় করবী
টগরের বেড়াগুলি জ্যোৎস্নালোকে হয়ে আছে ছবি—
যেন স্বপ্ন সবি
মন বলে, কোথা আজ কবি ।

১৬

চারদিকে জ্যোৎস্নার প্লাবন
চাঁদের আলোকে আজ স্নান করে শাস্তিনিকেতন

গাছপালা হেসে ওঠে অদ্ভুত উজ্জ্বল,
বৈভালিক দল
বেরিয়েছে আশ্রমের পথে
রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসে শালবীধি হতে ।
যেদিকে তাকায় মুকুটোখ
এ যেন আরেক দেশ, এ যেন আরেক স্বপ্নলোক
অসীম কালের বুকে ভেসে-ওঠা একখানি ছবি—
চিরদিন এটখানে কবি ।

১৭

শাল-বকুলের বীধি, আমলকি-বন
ঘুমায় এখন,
আশ্রুকুণ্ড গাঢ় অন্ধকার,
স্তব্ধ দেওদার,
হিমঝুরি শিমূল পলাশ
ছড়ায় গভীর ঘূমে স্মৃতির নিশ্বাস ।
সবি ঘূমে—তবুও এখন
জেগে আছে শাস্তিনিকেতন,
এইবার চিন্তে তার নামে কোন ধ্যান
অস্তরে উঠেছে কোন গান
এইবার সঙ্গী হবে কারা
হাতে একতারা ?
সারি-সারি ভালগাছ শূণ্যমাঠে জমায় পাহারা
দূরে কোন নক্ষত্র-ইশারা ?

১৮

এখানে ছাতিমতলে নিশ্চল ছায়ার বুক বেয়ে
নেমে যাও সস্তার অতলে :
দেখো চেয়ে
অঙ্ককার প্রাণগুহাতলে
একটি রক্তিম শিখা জ্বলে,
বেদীর উপরে
জাগে এক ধ্যানমূর্তি একা,
পড়েছে আলোক-লেখা ললাটে, অধরে
মুদ্রিত চোখের 'পরে,
বরাভয়-করে
জেগে আছে নিষ্পলক স্থির উর্ধ্বরেখা ।
এখানে প্রণাম করো
দীপ তুলে ধরো,
দেখো এই ছবি—
এই ধ্যানমূর্তি হতে জন্ম নেয় হিরণ্য কবি ।

১৯

চেতনার নিঃসীম অতলে
পুঞ্জ-পুঞ্জ অঙ্ককার জ্বলে
এক বিন্দু জ্যোতির প্রবাল
রচে ইস্রজাল
ফেনিল তন্ত্রার ঢেউ গুঠে
স্বপ্নের মঞ্জরী ফোটে
চকিত ঝলকে
মণিমরকতজাল দেখা দেয়, মিলায় পলকে ।

নীতের বিলাপ

(ত্রীনরেন গুহ, প্রীতিস্মিতেষু)

পূর্ণেন্দুবিকাস গুপ্তাচার্য

কাঁটা কাঁটা ফণিমনসা
নেই নেই আর ভরসা,
ছিঁড়ে নাও কটিকারী
হৃদয়ের রক্তঝারি ।

শাওনেই ঝরল যে নীল
কই তার কনকপ্রদীপ—
আশ্বিনে আর জলে না
অশ্বানে যায়নি চেনা ।

শিমুলের শুকনো ডালে
পলা ঝমে কোন সকালে,
মরা ঘাস, পাড়াশ মাঠে
শামুকের সময় কাটে ।

পাতা ঝরে রোশনিবাগে,
পাতা ঝরে হলুদ মাঘে,
পাখি নেই, পালক ছিঁড়ে
বিবিক্ত রিক্ত নীড়ে ।

কবে কোন গহিন গাঙে
হৃদয়ের হকুল ভাঙে
গুরু গুরু ঈশান মেঘে,
তীরে নীপ তরাস জেগে ।

চমকায় সৌদামিনী
মেঘবতী কুসুমিনী,
উতলায় মনের ময়ূর,
কলাপে কেকায় বিধুর ।

গেল কই কই বলো না
শাওনের কোন ছলনা...
তবে তোরা ধুলোই কুড়া
কিংবদন্তি কৃষ্ণচূড়া ।

কাঁটা কাঁটা কণিমনসা
নেই নেই আর ভরসা,
ছিঁড়ে নাও কটিকারী
হৃদয়ের রক্তঝারি ॥

চারটি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাণির স্বর শুনে

কে যেন কাদলো, অসুপনে
অনুট আর্তনাদকে ঢেকে হাটলো,
আবার ধমকে দাড়ালো। চোখের জলে
আবছা মুখের ছায়া কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।
কার বুকে গান বিঁধলো এমন ক'রে !

বর্ষা

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় ছুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে
বেহঁশ প'ড়ে আছে।

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া—
শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল।

শীত

কী যেন হয় মনে, কালো কুয়াশা যাখে রাত।
কী যেন হয় বুকে, কাঁপে শীতল শাদা হাত।
কী যেন চায় হৃদয়, দেহ তুধারে মোড়া খাদ—
তোমাকে কাছে টানি, তবু কেমন যেন স্বাদ !

কেন যে ওরা কাঁদে ? বুঝি পাহাড়ে ঘেসিয়ার ।
বিছানা ভরা ফুল, আহা ! বাতাসে হাহাকার ।
তোমাকে কাছে টানি, তবু এ-কোন পরমাদ—
ফুলের মতো দেহে কেন পোড়ো জমির স্বাদ !

টানের বুড়ি

(জীবনানন্দ দাশ কবি-কে)

"A young girl threading an invisible needle with invisible silk..."

সময়ের রেশমি সূতোয়
বোনে সে রূপের শেমিজ—
কী যে রূপ যায় না বলা
এমনই রঙের মায়া ।...
মেয়েটির ভাবনা তবু
তমালের আবছা ছায়া ।

আহা, কী রঙের জাদু,
চোখে যা যায় না-ধেখা !
তবু সে গানের মতো
হৃদয়ে জীবন আনে ।
মেয়েটির দিন যে গেছে,
দেখে তো হয় না মনে ।

মনে হয় সূতোই শুধু
চোখেরে দিচ্ছে কাকি—
বোনে যে, সেই মেয়েটি

কবিভা

আমি ১৩৬০

আমাদের কঙ্কাবতী।
কখনো নয়কো বাসি
এ-মতা মঙ্কাবতী।

আহা, কী মনের মায়া !
চলে যার পাক ধরেছে,
সে যখন বুনছে শেমিজ
আবিরেই হুঁচোখ কানা !...
মেয়েটির ভাবনা তবু
নীতেরই তুষার-কণা !

জলশিঁড়ি

আবদুল বাগচী

ঘুম ভেঙে চোখ রগড়ে তাকাও ভিক্ষে-ছবি-ভোর
মেঘলা মলিন জানালার কাছে বৃষ্টি-বাউল
আলতো আওয়াজে ছড়া কেটে যায়। পটের উপর
জলতুলি আঁকা নথ্য করুণ প্রেয়সী-পুতুল।

জলশাড়ি-পর্য্য এমন সুরেলা সকাল বেলায়
কাকে একা ঘরে ভালোবাসি, মন ?
মুখোমুখি কার সাথে মাতি বেলো বিস্ত্রি খেলায়
নানা হৃদয়ের তাসে উদ্দমন ?
(কাকে ফাঁকা ঘরে ভালোবাসি, মন ?)

ট্রাম-ছাড়া ভোর হকার-সকাল আয়নায় কাঁদে
বাইরে এখন বর্ষা-বিশাল বৃষ্টিরেখা,
হৃদয়-দীর্ঘ চিন্তায় নীল। গাড়ি আহ্লাদে
গতরাত্রির এলোখোঁপা মেঘ ঢেলে দেয় ঘুম।

~*~

চোরা-লণ্ঠন চোখে দিয়ে ট্রাম ছোট্টে ঠনঠন
সিঁড়ি সকালে। আবার মেঘের ছাতা-মুড়ি-ছাতা,
ঘড়ির কাঁটায় ছাউ-বুড়া-মুখ শহর কখন
হাঁটা শুরু করে, ধর্মতলায় বাড়ায় হু-হাত।

দুটি কবিতা

রাজলক্ষ্মী দেবী

কাছাকাছি ব'সে থাকা

কাছাকাছি ব'সে থাকা,—যখন অশ্রুরা কথা বলে,
হৃদয় সান্নিধ্যে ভরা ।

ওদের বিচিত্র কোলাহলে
যে-সমুদ্র গড়া হ'লো, তারি তীরে আমরা কুঞ্জন
সময়ের রঙিন ঝিল্লুক কুড়োলাম । ওদের কুঞ্জন
আমাদের সূক্ষ্ম শাদা মৌনতার দুই পাশ ঘিরে
কারুকারে বোনা হ'লো ।

—এ-মূহূর্ত আসবে না ফিরে
ফিরবে না এই দিনগুলি ।

হৃদয়ের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়
আধবুড়ো বোকা মন কী যে চায়, সারাদিন চায় ।
সুকৃত্যর এই শূন্যে সেই চাওয়া পাখা মেলে তার—
মনের সমুদ্রে লাগে অস্তুহীন ইচ্ছার জোয়ার ।
তারপর—কিছু নেই । শুধু এই কাছাকাছি আসা
—চোখে-চোখে যে-চাহনি—কী আশ্চর্য—তারো নেই ভাষা !

স্বপ্নের তো বন্ধা নেই

স্বপ্নের তো বন্ধা নেই । হিম্মে-জমা, সুক এক রাতে
আমার নিঃসঙ্গ স্বপ্ন খুঁজে-খুঁজে পেয়েছে তোমাতে

একটি দোসর। যেন, শাদা এক শীতে-কাপা পাখি
আমার হৃদয়, তার ভয়ে আর গৌরবে একাকী।
এই ছোটো পৃথিবীর বিবর্ণ গহ্বরে—কাছাকাছি—
কী আশ্চর্য মনে হ'লো, তুমি আছো, আমিও যে আছি।

তারপর দিন এলো—সেই দিন—চির-চেনা-জানা।
—স্বপ্ন-পেঙ্গুইন পাখি গুটিয়ে আনলো তার ডানা।
অকারণে হেরে গিয়ে, ছুঁড়ে দিয়ে হৃদয়ের সোনা
যদি ভুল ক'রে থাকি—তুমি কিন্তু বিদ্রূপ কোরো না ॥

অবিস্মরণীয়

শোভন সোম

জানালার ফ্রেমে আটকানো ছবি টুকরো আকাশ
কীণ অবকাশ

নানা-রং-মেঘে মোনালি কিংবা ধূসর দিনের
এতটুকু স্বাদ । কোথাও কি এর
বাইরে যাবার পথটুকু নেই ?

কে যেন বললে, এইখানে এই—
কে কথা বললে ?—জারুলের ডালো বেগনি হাওয়ার
ফিসফিস ডাক বাইরে যাওয়ার ।

চলে, বিলি কাটে, ঘাসের শিরায়
ছুটে আঙুল ।—আমার কী দায় !
ছুটে মেয়ের অবুখ ছলনা—বিকেলবেলার
অবাধ খেলার ।

জানালার ফ্রেমে গঁথে-দেওয়া ছবি টুকরো আকাশ
নীল, ঘন নীল । ভানবে এখন জ্যোৎস্নার ঈশ ।
কী ক'রে যে লিখি, কাগজ ওড়ায় অবুখ বাতাস ।

অবুখ বাতাস ?—মনে পড়ে বুঝি ?
অন্ধ গলিতে হাতড়িয়ে খুঁজি
কোথায় দরোজা ? হারানো বিকেল
বেগনি শাড়িতে— যেন উদ্বেল
ফুল-ফোটা কোন জারুলের ডালে ভোমরার ভিড় ?
—হাওয়া ছুঁড়ে দেয় এক ঝাঁক তীর ॥

‘জ্যোৎস্নার শাড়ি’ পাঠান্তরে

(বুদ্ধদেব বহু-কে)

অরুণকুমার সরকার

আশৈশব কবিতাকে ভালোবাসি । অশান্তি-বিস্কৃত
দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনায়
অলক্ষ্যলালিত লক্ষ আশাবৃক্ষ হোক বাতাহত,
আত্মকে যে দৈবী শূণ্যে দ্রষ্টারূপে অবস্থাপনায়
সমর্থ হয়েছি, তা তো কবিতা দেবীরই আশীর্বাদে,
কথার মদিরা পান ক’রে, শব্দধ্বনি এবং মনন
উভয়ের অত্যাশ্চর্য মধ্যে আর দাম্পত্য বিবাদে
তৃতীয় পুরুষরূপে সুখী পরিবারে একজন ।

যদিও কুমার আমি, মাঝে-মাঝে ঈর্ষায় কাতর
হয়েছি, স্বীকার করি, কথাকল্পনার নিত্যনব
রতিস্থখে । ভাবনাকে নিয়ে তাই আমিও বিস্তর
পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছি মনে-মনে । আয়ুত্মতী ভব,
বলেছি সুন্দরীদের অপপ্রিয়মান ছায়া দেখে ।
বলাই বাহুল্য আমি দেখেছি, আকিনি কোনো ছবি,
এবং আকলেও তার শব্দরেখা ডেকেছে নিন্দেকে ।
যে কবিতা পড়ে, প’ড়ে রোমাঞ্চিত হয়, সে-ও কবি
মূলত এ-ধারণায় ঘুরেছি কবির ঘরে-ঘরে,
এমন কি বিদেশেও, তবে অধিকাংশ স্বদেশেই,
কেননা মাতৃভাষায় তরতম ঘটে সমাদরে ।

কবিতা।

আমি ১৩৬০

আশৈশব কবিতাকে ভালোবেসে বুঝেছি প্রেমের
রূপ, কল্পনার তথা কবিতার আদি বাসস্থান ।
যেহেতু আপনার কাব্য আমার চিন্তার সমর্থন
যেখানে প্রজ্ঞায় প্রেমে নেই বর্ণদ্বৈতী বাবধান
তাই আনন্দিত চিত্তে সেই রাজ্যে করেছি ভ্রমণ ।

আষাঢ়ের বৃষ্টি

দীপক মজুমদার

অনেক বৃষ্টির পর
আবার নামে এই ধারা-আষাঢ়ের বন্যা
যখন পৃথিবী ক্লান্ত, রাত্রি তার তবঙ্গী মধুরিমা
হারিয়ে বিব্রস্ত।

অনেক কান্নার পর
আবার নামে এই বেদনার অভিজ্ঞান
আকাঙ্ক্ষার ত্রিপথগা
যখন হৃদয় রিক্ত, প্রেম তার প্রচিত আবেগশূন্য।
হারিয়ে বেপথুমান।

অনেক উষার পর
আবার ফুটে উঠলো এক নবকোরক উষা
উল্লসিত রক্তপলাশের
পুষ্প-পুষ্প আবির-প্রেমকে ছড়িয়ে দিয়ে
আকাশের মল্লিকাশুভ্র বুকে।

কাল সারা রাত ধ'রে বৃষ্টি ঝরেছে।
আজ এই সকালে তাই রঙের স্বাক্ষর !

অনেক কান্না আর হাসির দূত এই বৃষ্টি
তাই একে ভালোবাসি
এ এলে পুলকে মেতে উঠি
বাদামগাছের খুশিমস্ত সবুজ পাতার মতো।

গোমতীর ঘাটে—উদ্ভাসন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরালা ছপুর একলা কাটালে গুনতে পাই
নৈমিষ বন ডাকে ঘন-ঘন আঁজো--
যেন মনে হয় ট্রেনের সময়...বাজো ছইসল বাজো—
নানা যাত্রীর নিবেদ-ভরা একতলা সেই ছোটো সরাই, চমো ভরাই ।

স্মৃতিতে ছড়ানো সরিৎ যেখানে একান্ত বৈদিক
পুরাণের পাতা যেখানে ছড়ানো
ইতিহাস ব'লে মানো নাই মানো
কিংবদন্তী নেয় যদি মন ভাসিয়ে নিক ।
সত্যযুগের পুত ধূলি, পথ, ঢালু যে-তীর
কাছের গোমতী, দূরের ত্রিঙ্ক—

নিখিল দৈব পদরঞ্জকণা
প্রতি রোমকূপে ভ'রে কি নেবে না ?
মানস-শ্রোত্রে নেবে না কি ভ'রে পবিত্র বেদমন্ত্র বীজ ।
ঋষিযুগের ষোপকল্প স্তম্ভ ঘাট
ফিরে-ফিরে করে সনাতন সেই সত্য পাঠ
ঘাটে ব'সে দেখি কাঠের পাটায়
গ্রামীণ রজক কাপড় পিটায়
মাংসে চলেছে ডুব-জলে কোনো গৌরো যুবক
জলের কিনারে পা দুটি ডুবিয়ে দণ্ড গুনছে তাপস বক—
দূরেই ত্রিঙ্ক । ছপুর জাগিয়ে একটি ট্রেন নিত্য যার—
কোলাহলে ছিঁড়ে গ্রামের অলস আংরাখায়

ভারপরে সব আবার চূপ, ফের ঘুটে ওঠে স্তব্ধ রূপ,
...অমিত ধ্যান,
শাস্ত্র বুক। ছড়ানো পাখায় নিধর আকাশে ভাসার সুখ !
আকাশে মাটিতে কলে অস্তরে সমাহিত-থাকা সত্যযুগ।

মুখোমুখি হ'য়ে চেয়ে থাকে কে যে সারাক্ষণ
পুরাণ আগম এরই কাছে আছে ?
কে তুমি প্রাণের এতখানি কাছে
কে তুমি অতীত মনের মন ?
প্রত্যেকের পার থেকে শুনি ডাক দিয়ে যায় সত্যযুগ
পাষাণ মন তবু কেন থাকে অমুৎসুক ?
মুখোমুখি চোখ অপলক হ'য়ে চেয়েই রয়
বনে-অশ্বরে মন্ত্রশব্দে ঘোষণা হয়—
'খুঁজিছো আমাকে পাওনি কো তবু
মেনেছো কত যে মিথ্যা প্রতিভু
ওরে হুর্মেধা, বিমূঢ় ভ্রমী, দণ্ড দুয়ের আগন্তুক,
কপট সত্যতাকামী—
ভালো ক'রে ঢাখ, রাখ চিনে রাখ ;
এ যে আমি সেই আমি ।'

অঙ্গীকার

মণীন্দ্র রায়

তুমি কি আমারই আভি
তুমি সুখে আছ ?

আমি যে তোমার কাছে পৌছতে পারিনি
ব্যর্থতার সেই গ্লানি ইটের পাঞ্জার মতো। অলে ধিকিধিকি !
আমার আবেগে তারই আঁচ, আমার স্বপ্নেও তারই আভা।
মনের ভিতরে নেমে যদি দেখে কেউ
দেখবে সেখানে এক সূর্যাস্তের গনগনে আকাশ !

কিন্তু তুমি
তোমারও কি মনে এই যন্ত্রণার দাহ নেই ?
তোমার জীবন তোমার যৌবন হাহাকারে কাঁদে না কি
চৈত্রেয় মাঠের মতো শিমধরা রোদের হলকায় ?
তোমার নিঃসঙ্গ দিন অশান্ত রাত্রির
প্রতিটি মুহূর্ত কাচের টুকরোর মতো বেঁধে নাকি প্রতি পদক্ষেপে ?

আমি জানি তোমার জীবন
সে আমারই প্রতীক্ষায়।
তোমার সংসারে
উঠানে আগাছা আর ঝাঁকভাঙা উষ্মনের লজ্জা বুকে নিয়ে
ছন্নছাড়া অস্তিত্বের কেন্দ্রে তুমি একা
চেয়ে আছ আমারই আশায়।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬০

যতদূর দেখা যায় মাঠের আলোর পথ ধ'রে
মানুষের খোঁজ নেই ।
সারাদিন ঘর-বার, সারাদিন মন ভোলপাড় ।
জলন্ত হাওয়ার ঝাপটা শুধে নেয় হুঁচোখের জল ।
তুমি রিক্ত বিষাদপ্রতিমা !

অসহ্য, অসহ্য এই তৃষ্ণার গুমোট ।
তোমার নিঃশব্দ কান্না অকর্ষিত মৃত্তিকার মতো
প্রতি দুলিকণার শিরায়
খোঁজ মন্ত আষাঢ়ের সঘন আবেগ ।
আমি আর কতকাল ফিরি শূন্য আকাশের পারে
বহুদীন বৃষ্টিহীন মেঘের নির্জনে ?

আমার যন্ত্রণা আজ বিছাতের চাবুকর ধারে
যদি না বিদীর্ণ করে মেঘের হৃদয়,
যদি না তোমার বুকে নেমে আসি তীব্র আলিঙ্গনে
নিজেকে-নিশ্চিহ্ন-করা বৃষ্টির উল্লাসে,
তবে ব্যর্থ এই আর্তি—মিছে অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা

আমার যৌবন দিয়ে তোমাকে জাগাব প্রিয়তমা
এই তো আমার স্বপ্ন, এই তো আমার
রক্তের গোপন অঙ্গীকার ॥

আলেখ্য

বিষ্ণু ঘোষ

(৩)

চোখে বিছাৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,
সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা ।
চলায় বলায় তীরের ফসকে রোত্রে হীর। ঠিকরে ।

সে যেন তাতার সওয়ার এক
যেন বা গড়েছে তাস্কর কোনা ঐক,
আতত শরীর এই বুঝি দেবে টঙ্কার !
যৌবন তাকে ডাক দিয়ে যায় নিশ্চিত,

একটি আস্থা গ'ড়ে দেয় তাকে সিধা পথ ।
মনে মনে ভাবি হে প্রাণের দূত জীবনের দেশে প্রান্তরে
সব রাজপথ পার হ'য়ে তুমি ইন্দ্রধনুকে ঝাঁকিয়ে
মেঘের উপরে স্বচ্ছ হাওয়ায় আলবে আবার বিছাৎ ?

প্রজ্ঞাপ্রবীণ নয়নে ত্রিকাল, উঠবে আবার শিখরে
যেখানে মিশেছে সব সমতল একটি বিজয়ী হাশ্বে ?

আমি রাজা অন্ধকার ঘরে

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমি রাজা অন্ধকার ঘরে—

রানী আছে বহুজনা

চুন-খসা দেয়ালের গায়ে,

চুপিচুপি পায়ে

সাড়া তার কোণ-ঘেঁষা ভ্যাপসা গন্ধে বিবর্ণ বাতাসে

আমি রাজা অন্ধকার ঘরে—

অকারণ বিপ্রলম্ব অশ্রুত ঝংকারে

আমাতে আছাড় খেয়ে মরে,

স্মৃতি আর কথা আর সুরের আবেগে

পাল তুলে তুলে-তুলে আমারি সমুদ্রে

চিনেছি কখনো শাস্তি, কখনো বা ক্রোধে

শ্রদ্ধা আর প্রেম আর স্নেহের সম্মানে

জীবন চাইনি দৃঢ় একতার গানে

আমি রাজা অন্ধকার ঘরে—

তাই এই সাজানো পসরা,

এই শাক-শজি-দল ইট আর ইমারত গড়া,

এই যারা গভীর আশ্রয়,

অতিপ্রিয় ক-খ-গ-ঘ-ঙ-চ-ছ-জ,

রাত-দিন-হুপুরের মরণমরুর ঝড়ে

শুষ্ক শব, হীনরস, যৌবনেই কুরুপৃষ্ঠ জরা

তাই চিরপ্রিয়া
ভিক্ত রিক্ত রাতে আনে স্বাভিমুখী লিবিডোর ক্রিয়া।

আমি রাজ্য অঙ্ককার ঘরে,
আমি নেই শত লক্ষ কাকলীর কল্লোল-প্রভাতে,
আমি নই অগণ্য অখণ্ড কোটী জন,
আমি নই তাদের আপন—
মৃত্যু আনো, শাস্তি আনো,
নতুন জীবন আনো,
মেলো মেলো পাখা
তমিষ্রার পার হ'তে অনিবার্য আলোর বঙ্গাঙ্গা ॥

THE ALIEN

ELISABETH CROYDON

She walked like a slow-moving sonnet,
All rhythm and grace,
Unaware of the sharp, secret glances
Sly-drawn to her face.

Her dun-coloured English tweed jacket
A niggardly sheath
For the brightly inadequate sari
Displayed underneath.

She paused at a lighted shop-window,
Dark features intent
On a fire-spilling gem from her homeland,
A lone complement

To the vital and urgent, if flickering,
Flame of pure light
In her colour-starved heart, while she savoured
Its rippling delight.

Was it solace she found, ere she mingled
Again with the throng,
A lilt in her footstep, a sonnet
Translated to song ?

KAVITA

JUNE, 1953

Vol. 17, No. 4, Serial No. 74

ENGLISH SUPPLEMENT

In the following pages we present a group of translations from some of the notable Bengali poets of the present times. The selections are not comprehensive or adequate -- that would require the scope of an anthology rather than a magazine -- but they do represent the main trends and the more important "influences" operating on the younger generation of poets. We hope this supplement will serve our non-Bengali readers within and outside India as an introduction to modern Bengali poetry.

Except where otherwise mentioned, the poems have been adapted and translated by their respective authors.

EDITOR

•

NOTE

Earlier versions of Sudhindranath Datta's "Cyclone" and Buddhadeva Bose's "Kankavati" and "The Hija" appeared in different volumes of *Longmans Miscellany* (Orient Longmans Ltd.,) and of the latter's "Frogs" and "Morning at Chilka" in *Modern Bengali Poems* (Signet Press). Since their first publication, these have been entirely re-written by their authors.

KAVITA
CYCLONE

I

On days of rain I still remember her.
As soon as local green is overcast
With common grey, she comes, an image, sharp
In outline only, lighted symbol-wise
By fitful flares of memory, all eyes
And cheeks, like leading ladies just before
The curtain falls. And instantly, the show
And seer transfusing, I forget my years,
My forty years and more, the dewlap's spread
Across the glass, however much I stretch
To look at it, the swelling paunch which hides
The toes from downward glance, the overlay
Of hair confounded by the slightest breeze,
Allowing brow to take the place of crown.
Insurance, well I know, is life itself :
And yet the monthly premiums deplete
My daily menus, though all doctors say
That tissue-waste is certain at my age,
Unless the diet is inversely rich
In nourishment. And since I am alive,
How can I die until these eyes have seen,
If not all landlords dispossessed, at least
The mortgage on my neighbours' stately home
Foreclosed and Fortune's pampered darlings taught
A modicum of courtesy and sense ?

II

Sequestered by the rain, I lose all count
Of such events ; and, barely guessed, the lane
Emerging from my squalid lodging seems

A path untrodden yet but waiting for
 Forerunner's feet, and at its distant end
 A secret world invites discovery.
 I do not then remember that beyond
 The veiled horizons gleaners fight among
 The stubbles, while the fallow fields are sown
 With atavistic hate which death shall reap
 For centuries to come. There now on thrones
 Of banished or beheaded Caesars climb
 Contending tyrants, each more absolute
 Than he who went before ; all passion spent,
 The Lonely Watcher of the Skies sustains
 No longer nor protects ; and pushing out
 The Golden Stopper, chthonic darkness drowns
 The procreative cities of the ant.
 A noose of bombers hold the heavens fast
 And chokes the Primal Poet, in whose throat
 Afflatus rattles like a moribund's
 Expiring breath. Thus values must decay,
 And only those with landed property
 Refuse to see the universal ebb.
 But I am not of them, and, though, from dawn
 To dusk I spend in anxious thought, the mites
 I save occasionally, after back
 And belly have received their due, are vain,
 Because return from safe investment is
 So meagre. Yet I hear it argued that
 If Churchill's autocratic will is not
 Allowed free play, the Empire cannot last,
 And once the Commonwealth to chaos yields,
 Farewell to private enterprise whereon,
 As all agree, civilization rests.
 No wonder then my conscience finds it hard
 To single Hitler out for calumny.

KAVITA

III

But when her sacred presence comes to fill
The haunted void, on me descends a peace
That passeth understanding. This abode
Of fat and lymph and bitterness, my brute
And loathsome body, then, abruptly purged
Of time's excrescences and spatial faults,
Reverts to elemental purity.
And insulated in my changeless dreams,
An active hero of high tragedy,
I found Utopia where order reigns
Without the aid of soldiers, planes and guns.
There mercy tempers justice, sympathy
Becomes an attribute of intellect,
And love of life is immanent in all ;
No beast of prey infests the woods, to top
The hills is well within the competence
Of man, and in the endless summer days
The fabled river skirts the verdant banks,
Inciting youth to break their bonds and dance,
While, swept by fragrant winds, the lucid sky
Restores to earth in falling dew the hope
Of generations past and consummates
The pact between Briand and Stresemann.

IV

By then already cataclysmal clouds
Had massed perhaps, and, ambushed in their midst,
The Thunder God was sharpening his sword.
At least Il Duce had rehearsed his myths,
Exactly like refrains of savage chiefs

When war impends, and outcast Trotsky, still
 In search of sanctuary, might have been
 A medieval leper whose approach,
 Announced by bell, made doors and windows shut
 Along his path, as, almless, he regained
 The desolation. Yet the heritage
 Of countless sunsets in her glowing hair ;
 The lunar bloom of ripened grapes upon
 Her lissom limbs ; and limber lightning of
 Disdain revealing suddenly her eyes'
 Cerulean profundity ; the works
 Of Goethe, Hoelderlin and Rilke, with
 The tales of Thomas Mann, reposing in
 The alcoves ; Bach's sonatas nestling on
 The clavichord ; the lustrous ceiling of
 Centennial oak sweeping up to meet
 The gables ; sheltering the votive lamp
 Within her airy veil, the ageless town
 On vigil, with her rosary, beside
 The carefree bed of Culture lost in dreams —
 Against such sights the Nazis, looked at from
 My attic, could not but seem pigmy drolls,
 However much they heiled in unison
 And, waving smoky torches, trooped behind
 The Swastika. By contrast memory
 The more intently mourned, for its own sake
 And worth, the speechless parting in the rain.

V

I erred, of course, in thinking thus. -For truth
 And falsehood, good and evil, ugliness
 And beauty are reciprocally linked,

KAVITA

Because if either fades, its obverse, too,
Must disappear and, while they both exist,
The minus may become the plus, like poles
In alternating fields. Moreover, though
The wise maintain that those who claim to be
Specifically individual
Are outlaws bent on ruining the world,
Yet personal determination can,
When brought to bear upon the pendulum
Of change, accelerate or slow it down.
But, in that case, could Lila break her word,
And, since the clock has struck already twelve,
Would not the telephone have rung by now ?
She is not, all the same, a minx, as is
'That piece of pure frivolity she calls
Her friend ; at least she knows society
To need no sleep and walls to be possessed
Of cars, and consequently she is well
Aware how rare is opportunity
Of secret pleasure free from afterthought.
Has, then, the master of the house returned
Before the customary hour, impelled
By slanderers ? Or have a waster's taunts,
Despite their callowness, prevailed against
The deference my fruitful prime deserves ?
The will, at any rate, is impotent
And has, indeed, been proved a fiction more
Than once. But money talks, and anarchy
Itself is subject to its iron laws.
That is the reason why Marwaris grab
The pledged estates of prodigal Bengal
At auction sales, and none save beggars born
And perverts want a woman run to seed.

VI

Such dreams and resolutions are in vain,
 And even vainer is the fear of sure
 Senescence whence I seek concealment in
 Fragmental recollections conjured out
 Of isolating rain by mock revolt.
 But history abounds in periods
 Of hibernation, when the earth, a lost
 Somnambulist, is separated from
 The brotherhood of transcendental stars,
 And man, imprisoned in the dark night of
 The soul, can only chew the poisoned cud
 And contemplate the blighted future, like
 An augur reading in the innocence
 Of birth a sentence of unransomed death.
 The certitude of faith deserts him then ;
 And blind belief informs his panic prayers
 To old, indifferent and feeble gods
 For congruence and continuity,
 As once, unasked, the patriarchs received.
 Yet all the while his desolation grows,
 And, stranded in an island universe,
 He breathes his proper exhalations which
 No atmosphere absorbs or animates ;
 And though the the level heat of entropy –
 Incapable of further progress – burns
 Him, his impurities are not consumed,
 Nor does it warm the introspecting self
 Infected with the ague of a world
 Extinct. Departed is the inner guide
 Today, the outer ghosts have also fled,
 Their after-image being all I see :
 Old Lenin's mummy wrapt in mysteries
 Of Muscovy ; undaunted Trotsky felled

KAVITA

By hammer-blows : triumphant Stalin turned
To Hitler's friend ; the corpse of Spain ; Cathay
Approaching dissolution ; headless France
Exhibiting reflexive agony.
Alas, I have no means of finding out
If she is still alive or bombed to dust.

1940

SUDHINDRANATH DATTA

TWO POEMS

LAD AND LASS

It would have been better if the lad and lass
Passing along the beach where sea-birds flock the blue
Had noticed the difference in the yellow sands,

This long, loose world, the burnished noon
Trembling on tall masts ; better, if a sidelong glance
Had shown their personal hour of love

Encircled by large affinities : -- the dripping oars
Of Brooklyn boatmen falling on the verge
Of every day, the nets of human toil

Flung far out, the hot, red trail of smoke
Cleaving the air with the hammer-thud
Of labouring smiths and workmen.—For, on a certain day,

When the drooping day has revealed the gap,
They will find it far too hard to tolerate
Those necessary signs of more-than-two

Thrusting brighter shadows. The more they plumb
The deeps of universal intimacy
In their passage hand in hand along the beach,

The more the enchantment of their hearts
Will endure in deathless images
Such as some tramp may offer, unshaven, old,

Gazing at the sea with harsh, benevolent eyes,
Wondering if someone on the crowded jetties
Would at last understand his purpose. — Ah,
they do, the lovers,

And thus in each other they absorb the world,
And their keen sufficiency affects us all
Like the liner's call to travellers far and near.

1604 UNIVERSITY DRIVE

Not successively, but all together.

The thin hair ruffled
by wild winds, rustle of cypress leaves on the ear,
fragrance of coffee, the cool, thick taste
of honey on buttered toast,

and the clean, cool light
of rosy half-past seven in the morning.—
all together, bunched in a single moment,
gathered in the scent of eau-de-cologne
around the senses of the body,
my friend, I send you wings across the blue horizon.

KAVITA

the jug-jug rumbling trains, platforms asleep in the sun,
the remembered unconscious, lingering last night's dream,
—to get there and yet to look back—
now the bells tolling the lecture-hour, the hurried breeze,
this Altogether the mind's and senses' blend
take from my home in Lawrence —on the edge of the
golden wheat—
(Still the same address : sixteen-nought-four)
this gift from steps of farewell, a whiff of old lavender.

AMIYA CHAKRAVARTY

(*Translated by Buddhadeva Bose*)

FOUR POEMS

FROGS

The rains have come, and frogs are full of glee.
They sing in chorus, in deep, jubilant voices.

Nothing to fear today ; nor drought nor dearth of worms,
Nor serpent's jaw or stones of wanton boys.

Cloud-like, the grasses thicken ; in the fields the lush
waters stand ;
Louder leaps their hour of brief immortality.

They have no necks, but their throats are rich and swollen ;
And O, what sleek bodies, what cold gem-like eyes !

Eyes staring upwards, fixed in meditation,
Ecstatic, lidless, like *rishis*' gazing on God.

The rain is ceased, the shadows aslant,
Hymn-like floats their singing, on the slow, attentive air.

Now dies the day in silence, but a sombre drone
Perforates the twilight ; the thin sky leans to listen.

Darkness and rain, and we are warm in bed,
Yet one unwearied phrase mingles in our sleep.—

The final *sloka* of the mystic chanting,
The croak, croak, croak of the last fanatic frog.

THE HILSA

July has come to the skies, Bengal is numbed with rain.
On darkening Meghna's shores the slender palms
Grow dim like wraiths of smoke, and Padma, gorger of green
Villages, pounces upon a bank where an ancient house,
Still as a painted scene, awaits extinction.

Murky is midnight, the river crooked.
Ah the little boats, tossing in the torrent !
And who are those, half-naked, with taut and dripping muscles,
Flinging nets of hunger, tugging at heavy ropes ?
They are those who feed us, so I've heard.

At the end of the night the black, blind wagons at Goalundo
Are loaded with gleaming hills of silver,
Bright harvest of the water, hilsas by the hundred,
Darling sport of streams, slaughtered, dead.

KAVITA

Morning comes to Calcutta, unkempt and busy,
Like wives of clerks who stalk from bed to kitchen,
Where now the mustard smites, and the keen air spreads
The twanging joy of hilsa, hissing hot on ovens.

MORNING AT CHILKA

Ah the delight of dawn
On Chilka's shore.

The total sky that opens
Pure and clear, abandoned, beautiful,
Intolerably beautiful like the rise and fall of a voice
When song is full and free.

Ah the falls of light ! The haze of mist on hills
Leaning on slopes of light, while between
Chilka gleams and shimmers.

You were here by my side, but you have gone
To look at a train just in at the station.
Whiff goes the train. A pain whips my blood.
O how I love you !

Flood in the skies, brightness on the air.
Three cows are nibbling grass, intent, as if
Nothing else mattered. But nothing matters
Except what you and I have missed so long, and found
Here, by Chilka's shore.

Silvered now, the lake lies still,
Put to sleep by the extravagant sun
Pouring hot in kisses.—And ours ? oh, already

The rainbow hangs on the flood, to span the tides in our veins.
I never thought as much. Did you ?

Yesterday as our boat rocked along the lake, we saw
Two butterflies racing, chasing us across the waters.
'Ah foolhardy fliers !' you laughed. And I, to bear the joy,

Looked away where the water dimmed the sky,
And looked again at the float of light and deep,
The light of Now, the dark of new horizons
Trembling in your eyes.

KANKAVATI

Name, your name is the song,
Kanka, Kankavati !
Flowing from my heart to the world,
Kanka, Kankavati !

Bulge and pull of seas exploding on the night,
Tolling of bells in temples dark and deep,
Echoing peaks and caves when lightning strikes,
Red in triple tongue, loud in thunder —
Are all proclamations of the music in my heart —
Kanka, Kankavati !

Wheels of work all day drone your name, Kanka,
Turmoil of dreams cry out your name,
Silence before sleep croons your name, Kanka,
Little leaves of thought whisper your name.

Song, your name is the song.

KAVITA

Tell me, what have the stars to say, those burning eyes in
blindness ?
What is the meaning of winds, among the reeds and waters ?
And what the word of the water, lipping bold peninsulas ?—
All affirm and swell the music in my heart—
Kanka, Kankavati !

Fire of stars would die, if they did not ring your name,
Nor thought nor leaf would stir, but to whisper 'Kanka !'
And words just be words, if they did not live your name,
Nor ever word become song, but to cry out 'Kanka'—
O Kankavati !

BUDDHADEVA BOSE

TWO POEMS

DISPOSITION

Even though there were many rivers in my eyes once
When the dawn came in our home country
One river only was visible
And one woman walking
Along its banks as the mist dispersed.
In all the round gold of the sun
Like the constant glory of the human body
Her figure came.
The sun's large replete and pensive perimeter
Seemed to belong to her, her very own.
If now I plead with Time
To regain all this so long after

May it yield her memory in the patient light
 In the early hours of autumn twilight.
 Though hundreds and thousands die
 Like dazed flies in the world today
 There was a woman who could think
 "The water within the water of dawn's river
 Will flow for ever in the light of the sun."
 With natural yet fearful words like these
 She came to an end one day in the usual way.

(*Translated by Lila Ray*)

DARKNESS

In deep darkness
 I awoke once more
 Distracted by the splash and fret of the river flowing by.
 I saw the pale moon wont to gleam on Vaitarani
 Had caught Kirtinasha in its still noose of shade.
 I had slept by Dhansiri river on a cold December night,
 And had never thought of waking again.

O Moon, dimmed to a faint blue disc,
 Day's light you are not, you are not enterprise,
 ambition, or dream ;
 The quiet and peace of death,
 Its sleep—so dear to our heart
 Is like a holy tryst
 Which you moon have no means to spoil.

Do you not know, O Moon,
 Do you not know, O Night,
 I have gone to bed with Darkness,
 And slept with her

KAVITA

For long, silent ages ;
And then all of a sudden on a morning
I have found myself awake in the horrid crack
 of this earth's light —
So loud, so foolish !

The sun from a red sky, in a dry level tone,
 has called on me as a soldier
To range against foes I have never known.
The vast belt of the sun-bedevilled earth
Has shrieked and squealed like millions of pigs in merriment.
Ah, mirth !...a penumbra in my soul radiating darkness —
 darkness ever more.

O Man, O Woman,
I have never known your level ;
Nor am I a wanderer from another star.
Only this I have known that wherever there is movement,
 desire, work and thought
There are divisions of friends, families, nations, the
 whole range of day-time madnesses.

•

I am too full of sleep, of enveloping nescience ;
Why should you keep me awake ?
O Time, O Sun, O Kokil of January night, O Memory,
 O Winter wind,
Why stir to announce me to the day ?

Never more shall I waken
By the river's ruthless gurgling.
I shall not see how the dim, assorted moon
Divides her flickering between the River of Death
 and the River of Mutability.

By the waters of Dhansiri
 I shall go to bed with Darkness that never ends,
 The sleep that never abates.

JIBANANANDA DAS

Vaitarani—equivalent of Lethe.

Kirtinasha—lit., destroyer of great works. This epithet is synonymous with the river Padma, and refers to its erosive capacities.

TWO POEMS

AN ORDINARY GIRL

There is no crowd in the sky, only one cloud spread over,
 The lid is down on the wordy mouth of the earth.
 There is no argument, one dovesoft cloud
 Soothes the tired eye, casts peace on the body
 And brings her image to the mind, cool, ever so little eager.

O her ordinariness ! one likes her, simply ;
 Her mind is limpid, limited in concreteness,
 I know, she knows only the immediate, the diurnal.
 She has only the woman's narrow wisdom, common,
 No Mahasweta, never ; yet one likes to think of her.

The sharp hills have vanished. The sky is one rain-cloud.

KAVITA

SONNET

Golden the cowdust hour, yet in my hollow heavens
Burns the arid dream of an afternoon. O my azure heart !
Ecstasy grows pale over the flaming fields and forges
In desire, in love. Yet the awkward heart is cold.
I set sail on Jove's magic waters, yet it burns
Scarred and charred, for Lethe is but dead and dry.
O village cowherd-boy, O cooly-on-the-railway-lines, let
Life flow, let loose the floods, make me current in commonness.

Let this discord of body and mind, the world and the self
On the mound of this hydra's head sing into a green tree,
Strong and straight in the trunk, intimately earthy,
yet rich in airy foliage.
Let the Timons abdicate their doubts and debts,
And look ! Hegel's vainglory lying low on the ground,
In factories, in ploughlands, in the pavement paintings
of Matisse, in the street rallies of Mallarmè's pupils.

BISHNU DEY

ON IMMORTALITY

I cannot remember our parting kiss.
Remembrance is temporal.
We assented to part in a timeless stellar space
We departed through light and shade
Not to meet again.

I may remember a bad taste in my mouth.
Remembrance is temporary.

କବିତା

Now that I am all alone is a hard fact.
Oh there was none to weep and cover
My physical death,
None to discover a soul
Or console an anguished heart
For ever, ever.

Earth heaved and shuddered to recall
My immortality.
She let me die in her naked bosom.
She gathered her living creatures home,
To the heart of her daily life and lovely death,
And allowed me to lie there.

SONJOY BHATTACHARYA

THREE POEMS

AFTERMATH

In the next room a girl
is droning a lullaby
like leaves abandoned in the wind.
And in the dark forest of the skies
a red flame leaps and drops.

Storm before rain, flood after rain ; and when the rains
have swept away homes in hundreds,
mute beasts and muted men,
and the Famine Relief Society, themselves famished,
have filled the city streets with whining,

KAVITA

then, O lily of love, will you
return to conjugal concupiscence ?
O wan woman, flower of love, is there
any delight in love ! any joy
in bearing children ?

1900

This is the end of the sea.
And the wild dark flaps its wings
like flying birds
this is the end of the sea.
Deer roam no more in forests,
the green birds have all died,
and in cold grey caves of the hills
the wild dark flaps its wings
like flying snakes.
This is the end of the sea.
And in dim moonlight
gleam the waste sands of Time.

(Translated by Buddhadeva Bose)

NO ESCAPE

Harsh light fills the afternoon world.
Scared crows are winging their way homewards,
Autumn is imminent,
and Death stalks.

A solitary banyan stands
like an ancestral ghost.
Carve my name in rocks,
write my name on water.

My frantic heart goes seeking
solitude—the immensities
of Tibetan solitude.

Dusk falls,
The bloodless face of the day is masked in dimness.

And the hills darkly brood
as a thin mist spreads over the Sanial village,
and the crows, duped by the false dawn,
caw, and caw, until all sound
is merged in Time.

SAMAR SEN

YOUR BRIGHT EYES

Your bright eyes burn me again
and a wave of fire is heaving there.
Is the meaning of the throbbing silence of my heart
known to your bright eyes?

And many a time those bright eyes
have cast their shadow in the deep sky—
how I recognise them easily.

Forgetting the fatigue of life,
whenever I wanted to be all alone
your eyes mirrored a sport of utter destruction.

Your bright eyes have split my very existence
and have blotted out the meaning of victory or defeat.
Your bright eyes like sleepless sentinels
watch the boats of life and death glide silently.

KAMARSHIPRASAD CHATTOPADHYAYA

THE BIRD IN THE ORCHARD

That huge bird is ever there in the orchard :
 Sometimes in a dazzling flash he spins
 The branches, and shadows flung from his wings
 Dims the brilliance of leaves and fruits.
 Look at the quiet pond, the red-billed ducks
 Skimming the water as the laughing sun
 Spreads his fingers upon our cottage roofs.
 Will he rise and go, rise and leave behind
 These things that are ?
 It may be so, though I had never feared.
 Ever the pond will lap the bank, the wind at noon
 Will sigh for her whose eyes once were dark,
 And who entered into the water she will enter no more.
 These are her brass bowls, her bed, the cotton quilt,
 Her lambs and cows she loved so much.
 And these eyes did weave a dream one day
 Of life, of love, of togetherness.

But listen ! Something rustles in the orchard.
 A tiptoeing shadow darkens all other shades.
 The steel claws glisten, glisten all the while,
 And in a flash swoops down upon the prey.
 Meanwhile the neighbours return from the weekly market,
 The world is composed,
 And the sky is gay.
 But I had never thought of this before,

NARAYAN

EVENING AT THREE HILLS

The Sautal girls are singing.
Along the lanes of Three Hills village
In the dusk their tunes are echoed
Like some solemn evening prayer
Rising in a lonely temple.

"Oh Love ! My Love ! I'm but a girl ;
For thou I sing ; for thou I wear this breast-knot.
Come now to me. My breasts are like marble ;
They are like temples on a difficult rock."

The girls are singing, each embracing other :
And Three Hills glows like Love's Eternal City.

BIRENDRA CHATTOPADHYAY

MUNDA POEMS

1

Give the Big Man silken robes,
Give the Big Man silver bells,
My love should have a gift of laughter
To make a youthful husband, oh !

Give the Big Man robes and riches,
Give the Big Man halls of gold,
Let me have a lovely baby
To ride upon a pony, oh !

Forest, my forest, my forest !
 Your husband the heavens,
 Your youth the hill.

Your children how lovely !
 But some mischievous too !
 They dance, they pull to pieces,
 In the happy flow of life.

The trees — your sons.
 Daughters — the creepers.
 And how very nice of them
 To offer fruits as we pass !

The vultures, the kites, your daughters too,
 Your sons the lions, the tigers.
 Your daughters filch our prey,
 Your sons gulp down whole man !

Forest, my forest, my forest !
 Your husband the heavens,
 Your youth the hill.

Translated by Narash Chandra

SANTAL SONGS

The flute player went into his room.
 His flute lay outside forgotten.
 "O flute-player,
 What do you seek in your room ?
 Your flute is getting wet in the dew."

2

"O daughter, how far are you going ?
Where shall I find your home ?"
"I am going across the river
Where there is a date palm growing
In the courtyard of my home.
You will know the place by it."

3

The bridegroom is on his way.
Buy him a scarf and a dhoti.
How can I ? I've had bad luck with my crops.
A groom from the West
Is coming to my village
To take my daughter away,
To take his bride away.

4

When a bird sits on top of the hill
I bind it instantly with a spell.
Then I call to my brother at home,
"Go to market and get a gun.
We shall eat meat. What fun !"

(Translated by Nimai Chatterjee and Lila Ray)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সম্প্রকাশিত নতুন কবিতার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঙ্গর ভট্টাচার্যের 'পদাবলী'। কুড়ি বছর ধরে কবিতা লিখে এই কবি অনেক অনুরাগী পাঠক উপার্জন করেছেন; 'পদাবলী' প্রকাশের পর তাঁর পাঠকমণ্ডলী আরো অনেক ব্যাপক হবে বলে আমার বিশ্বাস। কেননা এই গ্রন্থটিতে সত্যিকার নতুনত্ব আছে, সঙ্গর ভট্টাচার্যের মানসিক বিবর্তনে নতুন একটি পর্যায় এখানে ধরা পড়ে—যেন প্রায় নতুন ক'রে আদৃত করার মতো ঈর্ষাবোগ্য তাক্রণ্য এই বইয়ের সুনিবিড় গীতিকবিতাগুলো প্রকাশ পেয়েছে। ছন্দের বৈচিত্র্য, ভাষার কমনীয়তা, ভাবের ঘনত্ব এই রকম টাটকা সজীব একটি কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনেকদিন আমার চোখে পড়েনি। কবিকে অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বভারতীর বিশ্ব-বিজ্ঞানসংগ্রহে নতুনতম সংযোজন প্রিয়রঞ্জন মেন প্রণীত 'ওড়িয়া সাহিত্য' এবং স্বধাংসুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অসমীয়া সাহিত্য'। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রবেশ-পথ আঙ্গকের দিনে আর অবরুদ্ধ নেই; বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পরের গভীরতর পরিচয়ের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ নানা দিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রি. ই. এন-সংসদ অল্পরূপ একটি ইংরেজি গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেছিলেন, সেই প্রচেষ্টা বলতে গেলে মধ্যপথেই থেমে গিয়েছিলো। আশা করি বিশ্ববিজ্ঞানসংগ্রহে এ-বিষয়ে আরো বেশি উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া যাবে, কালক্রমে অল্পাংশ ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গেও বাঙালি পাঠকের মুখচেনা করিয়ে দেবার ব্যাধা থাকবে না। পুস্তিকাগুলির স্বীর্ণ পরিসরের মধ্যে মুখচেনার বেশি কিছু সম্ভব নয়, কিন্তু এই প্রাথমিক পরিচয়ের ফলে নিবিড়তর যোগাযোগের বেগ ছেগে উঠবে না, সে-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

বু. ব.

বিজ্ঞপ্তি

'পোইট্রি লণ্ডন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক থাথামট্টু মার্কিন দেশে দুটি ভারতীয় কাব্যসংকলন সম্পাদনার ভার নিয়েছেন : একটি Golden Book of Indian Verse, অন্যটি Indian Love-Songs। এই সংকলন দুটিতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক ও পুরোনো বাঙালি কবিদের এবং মৌতাল প্রভৃতি লোকসংগীতের অনুরূপাদের জন্য তিনি আমাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন : এখান থেকে কবির বাঁদী তাঁদের স্বকীয় বা অন্যদের রচনার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনূবাদ ক'রে তাঁকে পাঠান, তাহ'লে সেখান থেকে বাছাই ক'রে যথাযথরূপে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে বিলেতি ও মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশ করার ভার নিতেও তিনি ইচ্ছুক। রচনা প্রকাশিত হ'লে তার সম্মানমূল্য মূল করি ও অনূবাদকের মধ্যে বিভক্ত হবে, এই কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

আশা করি বাংলাদেশের কবিরা তাঁর এই আহ্বানে নিকন্তর থাকবেন না ;
রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যের বৈদেশিক প্রচার এখন সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয় ।
রচনা পাঠাবার ঠিকানা : T. Tambimuttu, 338 East 87th Street,
New York, N. Y., U. S. A.

সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি

‘কবিতা’র এই আবার সংখ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পাদকীয় বর্ষ শেষ
হ’লো । গ্রাহকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে, তাঁরা যেন অষ্টাদশ
বছরের চাঁদা (চার টাকা) আগামী ১লা অক্টোবরের মধ্যে
মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেন । যারা আর গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন,
তাঁদের নিবেদাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো বাঞ্ছনীয় । যাদের
কাছ থেকে চাঁদা বা নিবেদাজ্ঞা কোনোটাই পাওয়া যাবে না, তাঁদের
সকলকেই ভি. পি. যোগে আগামী আশ্বিন সংখ্যা পাঠানো হবে ।
ডাকঘরের রেজিস্ট্রেশন এবং ভি. পি.র মাণ্ডুল সম্প্রতি অনেক বেড়ে
গেছে ; ভি. পি. ফেরৎ এলে আমরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবো, এই কথাটি
স্মরণে রাখার অনুরোধ জানাই ।

এই প্রসঙ্গে নিবেদন করি যে আমাকে এক বছরের জন্ম বিদেশে
যেতে হচ্ছে । আমার অনুপস্থিতি-কালে ‘কবিতা’র পরিচালনায়
নিযুক্ত থাকবেন শ্রী নরেশ গুহ ও প্রতিভা বসু । আমিও দূরে থেকে
যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা ক’রে চলবো । ‘কবিতা’র প্রকাশের
জন্ম রচনা ও বিজ্ঞাপন, ‘কবিতা’র চাঁদা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক
চিঠিপত্র, সবই পূর্ববৎ “সম্পাদক, কবিতা” এই নামে কবিতাভবনের
ঠিকানায় পাঠাতে হবে । ‘কবিতা’র লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও
অন্যান্য বন্ধুরা এই পত্রিকাটির উপর যথাপূর্ব স্নেহদৃষ্টি রাখলে আমি
নিজেকে বাধিত বোধ করবো, এবং ‘কবিতা’র মধ্যে নিরন্তর
উপস্থিত থাকতে আমারও প্রয়াসে কোনো ক্রটি হবে না ।

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, ‘কবিতা’
কবিতাভবন

২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২২